জনসংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(ভারতের পটভূমিকা)

সবিতা গুহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

জনসংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(ভারতের পটভূমিকায়)

ডঃ সবিতা গুহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

JANASANKHA TATTAER BYABAHARIK PRAYOG

(BHARATER PATABHUMIKAYA)

SABITA GUHA

প্রকাশকাল—মে ১৯৮৭

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : দশ টাকা

Published by Dr. Ladli Mohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

ভূমিকা

জনসংখ্যা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনার ব্যবহারিক দিকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কোনও দেশের জনসমষ্টির সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনও ধারণা করতে গেলে আদমসুমারী তথ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। পারম্পরিক লোকগণনা ধারাবাহিক তথ্য যোগায়। আবার জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুসংবদ্ধ আলোচনা জনসংখ্যার গঠন, প্রকৃতি, গুণগত অবস্থার ব্যাখ্যা করে।

জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি আলোচনা করে এদের ব্যবহারিক প্রয়োগের উপরেই বেশী গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি। সমস্ত উদাহরণই ভারতের বিভিন্ন আদম-সুমারী, নমুনা সমীক্ষা প্রভৃতির থেকে সংকলিত। তাত্ত্বিক আলোচনাকে যথাসম্ভব সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। এই স্বল্পপরিসর আলোচনা সর্ব-সাধারণের কাছে সহজবোধ্য হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

বিভিন্ন সময়ে Indian Association for the Study of Population এর নানা আলোচনাচক্র আমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিশেষ করে Indian Statistical Institute এর একটি Orientation Course এ অংশ গ্রহণ করে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। অবশ্য এই প্রথম প্রচেষ্টা ত্রুটিমুক্ত নয়। এর সব ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় একান্তই লেখিকার।

সবিতা গুহ

চুঁচুড়া
১৪ই বৈশাখ, ১৩৯৪ সন।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়—ভারতের লোকগণনা ১—২৪

1·1 লোকগণনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ; 1·2 1961, 1971, 1981 সনের লোকগণনা তথ্য সম্পর্কিত আলোচনা ; 1·3 জনসংখ্যা তথ্য আহরণের বিভিন্ন উপায় ; 1·4 1981-র লোকগণনা ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম যোজনাকাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়—অর্থনৈতিক প্রগতি ও জনসম্পদ ২৫—৪৮

2·1 জনজীবনের পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক প্রগতি ; 2·2 কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি ; 2·3 ভারতের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি ; 2·4 পরিযান ও নগরমুখীতা ; 2·5 উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার মূল্যায়ন।

তৃতীয় অধ্যায়—ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাপকের ব্যাখ্যা ৪৯—৭২

3·1 বয়স বিশেষিত গঠন ; 3·2 নারী-পুরুষ অনুপাত ; 3·3 প্রজনন ; 3·4 সংজনন ; 3·5 মরণশীলতা ; 3·6 জীবন সারণি ও প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল।

চতুর্থ অধ্যায়—জনসংখ্যার গুণগত বিচার ৭৩—৯০

4·1 জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান ; 4·2 জনজীবনের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ; 4·3 বিবাহ রীতি ও পরিবার প্রথা ; 4·4 সামাজিক স্তর বিন্যাস ; 4·5 জীবনযাত্রার মান ও উৎকৃষ্ট জীবন স্তর সূচক ; 4·6 ভারতের জনসংখ্যার গুণগত বিচার।

পঞ্চম অধ্যায়—জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ ৯১—১০৫

5·1 আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিঃপ্রক্ষেপণ রীতি ; 5·2 প্রজনন সংক্রান্ত বিশেষ ধারণা ভিত্তিক ধরন ; 5·3 মরণশীলতা সংক্রান্ত বিশেষ ধারণা ভিত্তিক ধরন ; 5·4 জনসংখ্যা প্রক্ষেপের সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ কথা ; 5·5 ভারতে জনসংখ্যা প্রক্ষেপের প্রচেষ্টা।

ষষ্ঠ অধ্যায়—জনসংখ্যা নীতি ১০৬—১২৭

6·1 জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা ; 6·2 জাতীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ; 6·3 জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি ; 6·4 জনজীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধন নীতি ; 6·5 আয়ুষ্কাল ও জনসংখ্যা নীতি ; 6·6 ভারতের জনসংখ্যা নীতি ও তার মূল্যায়ন।

প্রথম অধ্যায়
ভারতের লোকগণনা

1.1 লোকগণনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমান যুগে পরিসংখ্যানের সহায়তায় জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনাই মূলতঃ জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। জনসংখ্যার পরিমাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি, জন্ম হার, মৃত্যু-হার প্রভৃতি বিষয়ে এই তত্ত্বে আলোচনা করা হয়। একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রগতি জনসংখ্যার গতি, প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাত্ত্বিক আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু জনসংখ্যা তথ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রয়োগ। একটি দেশ কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক অঞ্চলই নয় এটি একটি জনগোষ্ঠী। দেশের উন্নতি অর্থে আমরা এই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উন্নতি বুঝি। সুতরাং জনগোষ্ঠীকে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ না করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। শুধু তাই নয় রাজ্য পরিচালনার জন্যও মোট জনসংখ্যা ও তার বয়স বিশেষত গঠন, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই বহুকাল ধরেই বিভিন্ন দেশে লোকগণনার রীতি প্রচলিত। রাজস্ব সংগ্রহ, সৈন্যদল গঠন প্রভৃতি প্রয়োজনে জনসমষ্টির সঠিক ধারণা করার গুরুত্ব শাসকবর্গ বুঝতেন। তবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা, সূত্র মেনে নিয়ে লোকগণনা করার প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষেও প্রতি দশবৎসর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে লোকগণনা করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ শাসনকালেই ভারতে প্রথম সরকারী-ভাবে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আদমসুমারী প্রথা চালু হয় তার আগেও নানা সময় নানাভাবে এক এক জন শাসক তাঁর অঞ্চলে মোট জনসংখ্যা পরিমাপের প্রয়াসী হয়েছেন। পরবর্তী-কালের জনসংখ্যা তাত্ত্বিকেরা এইসব প্রচেষ্টাকে ভিত্তি ক'রে প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সময়ে মোট জনসংখ্যা নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। যদিও ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে কারণ তাঁদের মূলহিসাব খণ্ডিত অঞ্চলের।

তাত্ত্বিকেরা সাধারণভাবে মনে করেন যে প্রাচীন ভারতে 300 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আনুমানিক জনসংখ্যা 10.0 কোটি থেকে 14.0 কোটির মধ্যে ছিল।[1] তাঁরা আরও মনে করেন যে অতীতে বহুদিন পর্যন্ত জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় ছিল। মিঃ মোরল্যাণ্ড (1920) আকবরের সময় কৃষি জমি-জনগোষ্ঠী ও সৈন্যদল-জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক বিচার ক'রে 1600 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা মোট 10 কোটি ছিল ব'লে অনুমান করেন।

এই জাতীয় তথ্যের উপর ভিত্তি করে মিঃ কিংসলে ডেভিস 1600 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা আন্দাজ 12.5 কোটি ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতেই পরবর্তী দু-শতাব্দীতে ভারতের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। এগুলি সবই বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যার পরিমাপ।

ভারতে সুসংবদ্ধভাবে আদমসুমারী গ্রহণের চিন্তা দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে। তবে তার আগেও বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অংশে আংশিক লোক-গণনার নজির রয়েছে। যেমন লর্ড ওয়েলেসলী 1801 সনে বাংলা প্রেসিডেন্সির জন-সংখ্যার হিসাব নিয়েছিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এই ধরনের কাজ বার তিনেক করা হয় – (1820-'28 সনের মধ্যে, 1845 সনেও 1855-56 সনে)। মাদ্রাজ প্রেসি-ডেন্সিতে 1821-22 ও 1837-38 সনে লোকগণনা করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 1848, 1853 ও 1865 সনে পরপর লোকগণনা করার নজির রয়েছে। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে 1850 সনে একবার লোকগণনা করা হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন-কোনও ছোট অঞ্চলে লোকগণনার কাজও সময় সময় নেওয়া হয়েছে। যেমন কবিগুরুর পিতামহ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় 1822 সনে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে থানাভিত্তিক গৃহ গণনা করিয়েছিলেন।

যাই হোক এই সমস্ত আংশিক প্রচেষ্টাকে ভিত্তি ক'রে এবং জনসংখ্যা প্রক্ষেপের নিয়মকানুন কাজে লাগিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার পরিমাপ করতে অনেক বিদগ্ধজন এগিয়ে আসেন। 1800 সন থেকে 1871 সনকে ভারতের প্রাক-আদমসুমারীর যুগ বলে ধরা যেতে পারে। কারণ 1872 সনেই প্রথম প্রথাগতভাবে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে লোকগণনা করে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। আমরা এই প্রাক আদমসুমারী যুগের মোট লোকসংখ্যা পরিমাপের দুটি তালিকা নিবদ্ধ করছি।

পরের পাতার তালিকাটি স্বর্গীয় শ্রীপি, এন, আগরওয়ালা নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একসাথে নিবদ্ধ করেছেন।

1855 সনে তিনি দুটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উভয় পরিমাপের মধ্যে

সারণি 1 : 1
ভারতের জনসংখ্যার পরিমাপ
(1800 সন হইতে 1874-75 সন)[2]

বর্ষ	উৎস	জনসংখ্যা (কোটি)
1800	প্লেফেয়ার	12·0
1820	হ্যামিলটন	13·4
1834	ম্যাকুলক	13·0
1845	ম্যাকুলক	13·0
1855	মুখ্য পঞ্জীয়ন, গ্রেট ব্রিটেন	17·5
1855	সংসদীয় পত্র	18·1
1865	সংসদীয় পত্র	19·1
1867	মুখ্য পঞ্জীয়ন, গ্রেট ব্রিটেন	19·4
1871	ডেভিস	25·5
1874-75	সংসদীয় পত্র	23·8

পার্থক্য খুবই সামান্য। এই তালিকার একটি প্রধান ত্রুটি যে এতে ভৌগোলিক অঞ্চলের আয়তনের কোনও উল্লেখ নেই। জনসংখ্যার পরিমাপের মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রে 20 বছরের ব্যবধান। আবার শেষের দিকে দুই/চার বছরের ব্যবধানেই তিনটি তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সত্তর বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় তালিকাটি স্বর্গীয় অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ও শ্রী দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সত্তর বছরের ধারাবাহিক জনসংখ্যা পরিমাপের সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা।

সারণি 1 : 2
ভারতের জনসংখ্যা (1801-1871)[3]
আয়তন 1,582,989 বর্গমাইল

বর্ষ	জনসংখ্যা (কোটি)	পূর্বের দশকে শতকরা পরিবর্তনের হার
1801	20·7	—
1811	21·5	+3·86
1821	20 5	−4·65
1831	21·6	+5·37
1841	21 2	−1·85
1851	23·2	+9·43
1861	24·4	+5·17
1871	25·6	+4·92

জনসংখ্যা পরিমাপের বিভিন্ন নীতিকে প্রয়োগ করে এই দশ বৎসর অন্তর ধারাবাহিক জনসংখ্যার হিসাব এই তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। এই তালিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার (ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের) পরিপ্রেক্ষিতে এই হিসাব দাখিল করা হয়েছে। প্রতি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। কোনও কোন দশকে জনসংখ্যা হ্রাসও পেয়েছে। কেবলমাত্র 1871 সনের পরিমাপ ছাড়া তালিকা দুটির পরিমাপগুলিতে সর্বক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবতঃ শ্রী আগরওয়ালার আহরিত তথ্যগুলি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রযোজ্য নয়। অধ্যাপক মহলানবীশ তাঁর প্রদত্ত পরিমাপগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকলেও প্রাক লোকগণনা যুগের এটি সবচেয়ে সুসংবদ্ধ তালিকা।

স্বাধীন ভারতের ভৌগোলিক সীমার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা পরিমাপ ক'রে মিঃ এইচ, ভি, প্যারি[4] দেখিয়েছেন যে 1800 সন থেকে 1850 সনের মধ্যে জনসংখ্যা আনুমানিক 15.4 কোটি থেকে 18.9 কোটিতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ গড়পড়তা বৃদ্ধির হার .45 এসে দাঁড়ায়। অধ্যাপক মহলানবীশের তালিকাতে 1851 সন পর্যন্ত গড়পড়তা বার্ষিক বৃদ্ধির হার ·25 দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার জন্যই আমরা প্রাক আদমস্থুমারী যুগের লোকসংখ্যার কিছুটা ধারণা করতে পারি।

1865 সনে ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজ স্থির করেন যে 1871 সনে একটি সর্বভারতীয় (ব্রিটিশ শাসনভুক্ত অঞ্চল) আদমস্থুমারী গ্রহণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে মিঃ ডবলু, ডবলু, হাণ্টারের অবদান উল্লেখযোগ্য। 1871 সনেই প্রথম নানা সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পরপর লোকগণনা করা হয়। এই গণনায় কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। এবং আদমস্থুমারীর মূল নিয়ম অনুসারে একই সময়ে এক সাথে লোকগণনা করা হয়নি। তবুও 1871 এর নানাস্থানের সংগৃহীত তথ্যকে একত্রীভূত করে 1872 সনে মোট জনসংখ্যার হিসাব দাখিল করা হয়। 1881 সন থেকে নিয়মমাফিকভাবে দশ বৎসর অন্তর ব্রিটিশ ভারতে লোকগণনা হয়ে আসছে। তবে 1921 সনের আদমস্থুমারী পর্যন্ত ভারতের কোনও না কোনও অংশ বাদ পড়েছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক সীমা রদবদল হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর পুরাতন ব্রিটিশ ভারত, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি ভারত ইউনিয়নভুক্ত হয়েছে। ফলে দশ বৎসর অন্তর আদমস্থুমারীর তথ্যর তুলনামূলক আলোচনা ভারতে কঠিন।

দেশ বিভাগের আগে ভৌগোলিক সীমার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 1936 সনে ব্রহ্মদেশকে পৃথকীকরণ। 1956 সনের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে রাজ্য সীমার পরিবর্তন ঘটে। পর্তুগীজ ও ফরাসী শাসিত অঞ্চল-

গুলি যেমন গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা নগর হাভেলী, পণ্ডিচেরী সমসাময়িককালে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। 1961 সনের পরে আবার পাঞ্জাব, আসাম, হিমাচলপ্রদেশের বিভাজন ঘটে। নূতন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হয়। এই সব বিভাজনের ফলে আন্তঃরাজ্য তুলনামূলক আলোচনাও সবক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। 1971 সনের লোকগণনার পরে 1975 সনে সিকিম ভারতের রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এই ধরনের বিবর্তনের ফলে ভারতের সার্বিক ভৌগোলিক সীমার বিশেষ রদবদল হয়নি। চীনের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণ চূড়ান্ত হ'লে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে ভৌগোলিক সীমার কিছু পরিবর্তন ঘটবে। সেই সঙ্গে জনসংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাবে। তবে এই সুবৃহৎ দেশে যেখানে জনসংখ্যা পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সেখানে স্বল্প রদবদল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে ভৌগোলিক সীমা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ব্রিটিশ ভারতে 1941 সনে শেষ লোকগণনা করা হয়। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের প্রতিবেদন অনুসারে 1941 সনে ভারতের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা 17.30 ভাগ ও এশিয়ার জনসংখ্যার 32.10 ভাগ ছিল। আয়তনে ভারত বিশ্বের শতকরা 3.03 ভাগ ও এশিয়ার শতকরা 15·01 ভাগ ভূমি অধিকার করে ছিল। এই আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মহলানবীশ প্রদত্ত ব্রিটিশ ভারতের আদমসুমারীর ফলাফল নিচের তালিকায় উপস্থাপিত করা হ'ল।

সারণি 1 : 3
ভারতীয় উপ মহাদেশের জনসংখ্যা
(1871-1941)[5]
আয়তন—1582989 বর্গ মাইল

বর্ষ	জনসংখ্যা (কোটি)	পূর্বের দশকের শতকরা পরিবর্তনের হার
1871	25·6	—
1881	25·8	+0·78
1891	28·3	+9·69
1901	28·6	+1·06
1911	30·4	+6·29
1921	30·7	+0·99
1931	33·9	+10·42
1941	38·3	+12·98

(জনসংখ্যা পরিবর্তনের শতকরা গড়পড়তা গাণিতিক বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে)

বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক সীমার পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ এইচ, ভি, প্যারি অনুরূপভাবে ওই একই সময়েও একটি দশ বৎসর অন্তর জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

প্যারি প্রদত্ত তালিকা নিম্নরূপ :—

সারণি 1 : 4

ভারতের জনসংখ্যা (1871-1941)[6]

আয়তন—1217989 বর্গ কিঃ মিঃ (বর্তমান ভারতের অনুরূপে)

বর্ষ	জনসংখ্যা (কোটি)	পূর্বের দশকের শতকরা পরিবর্তনের হার
1871	20·91	—
1881	21·09	+0·9
1891	23·14	+9·7
1901	23·84	+3·0
1911	25.21	+5·7
1921	25·13	−0·4
1931	27·89	+10·9
1941	31.87	+14·3

(এক্ষেত্রেও জনসংখ্যা পরিবর্তনের হার পূর্ববর্তী তালিকার অনুরূপ)

ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্নতার জন্য মোট জনসংখ্যার পার্থক্য ঘটলেও জনসংখ্যার পরিবর্তন হার দুটি তালিকার মধ্যে তুলনীয়। প্রথম তালিকায় 1911 থেকে 1921 সনে জনসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় তালিকায় বিভক্ত ভারতের অংশে জনসংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। 1881-91র দশকে ও 1921-41 এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাধীন ভারতে 1951 সনে সর্বপ্রথম লোকগণনা হয়। ওই বছরই ভারতে পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। জনসংখ্যার তথ্য পরিকল্পনার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সুষ্ঠু তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। 1948 সনে সেন্সাস আইন পাস হয় এবং 1949 সনে ভারত সরকার কেন্দ্রের প্রশাসন মন্ত্রকের (হোম ডিপার্টমেণ্ট) অধীনে দেশের আদমসুমারী ও জনসংখ্যা তথ্য সংগ্রহের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বর্তমানে জনসংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সংগ্রাহক ও সংরক্ষক মুখ্য পঞ্জীয়নের দপ্তর (ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিস) প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই দপ্তরের প্রধান অর্থাৎ মুখ্য পঞ্জীয়ন

পদাধিকার বলে লোকগণনার বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কার্য পরিচলনা করেন। এঁর অধীনে রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একজন লোকগণনা অধিকর্তা (ডাইরেকটর অফ্ সেন্সাস) নিযুক্ত হন। এঁদের সম্মিলিত পরিচালনাধীনে বিরাট এক অস্থায়ী কর্মীবৃন্দ দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে আনে। জেলার ও ব্লকের শাসন যন্ত্রকেই এই কাজে লাগান হয়। লোকগণনার 1 বছর আগে জেলা তথ্য অধিকর্তা ও তার অধীনস্থ শাসনযন্ত্রকে লোকগণনার কাজে আনা হয়। তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা। এই প্রশ্ন রচনা করার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রত্যেকটির উপযুক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন। জনগণনার ভিত্তি ইউনিট 'ব্যক্তি' কিন্তু ব্যক্তি একটি গৃহের অংশ। স্থতরাং গৃহস্বামীর কাছেই তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নলিপি উপস্থাপিত হয়। গৃহভুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নানারকম তথ্য এই প্রশ্নলিপির সাহায্যেই সংগৃহীত হয়। 1872 সন থেকে এই ধরনের ছোট ছোট প্রশ্নলিপি বা সেন্সাস সিডিউল তৈয়ারী করা হয়েছে। এক এক সময় এক একটি নতুন তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা দেখা গেছে। যেমন 1872 এর সিডিউল এ গৃহের ছাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল। 1941 এ মহিলাদের প্রথম সন্তান প্রসবের সময় বয়স কত প্রশ্ন করা হয়। মোটামুটি ধর্ম, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থ নৈতিক পেশা, বয়স, স্ত্রী পুরুষ ভেদ, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়েই প্রশ্ন রাখা হয়। 1961 সন থেকে প্রশ্নলিপিকে স্থগঠিত করার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে।

সাধারণতঃ দুই উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গৃহস্বামীকে প্রশ্নলিপি দিয়ে উত্তর পূরণ ক'রে দিতে বলা হয়। আবার শিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্যসংগ্রহকারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রশ্নলিপির মধ্যে উত্তর সংগ্রহ ক'রে আনতে পারেন। ভারতে দ্বিতীয় প্রথা চালু। এখানে স্বাক্ষরতার হার কম। স্থতরাং দ্বিতীয় প্রথাই এদেশে গ্রহণযোগ্য।

1.2 1961, 1971, 1981 সনের লোকগণনা তথ্য সম্পর্কিত আলোচনা

স্বাধীন ভারতের প্রথম আদমস্থমারী 1951 সনের প্রতিবেদনই একটি নতুন পদক্ষেপের স্থচনা হয়। প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম ভারতের জনসংখ্যার গঠন ও আয়তনের পরিবর্তনের কথা আলোচনা করে জীবনযাত্রার মানের উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জন্মহার হ্রাস করার যৌক্তিকতা আলোচিত হয়েছে। এই বছর লোকগণনাকে আরও নির্ভুল করার জন্য কিছু নমুনা পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে গণনার পরবর্তীকালে ভুলত্রুটি নজরে আসে। এই প্রথম গ্রাম ও নগরের তথ্য পৃথকভাবে দেখান হয় ও জেলাভিত্তিক তথ্য (ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক)

প্রকাশিত হয়। ধর্মের পরিবর্তে জীবনধারণের উপায় অর্থাৎ পেশাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন তথ্য দ্বিমুখীভাবে উপস্থাপিত হয়। 1951 সনে[7] ভারতের মোট জনসংখ্যা 36.11 কোটি ছিল তার মধ্যে মোটামুটিভাবে শহরবাসীর সংখ্যা 6·2 কোটি অর্থাৎ শতকরা 17.35 ভাগ। বসতির ঘনত্ব 51 সনে প্রতি বর্গ কিঃ মিতে 117 জন ও নারীর সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষ পিছু 946 জন। ভারতে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। 1951 সনে হিন্দী ভাষা-ভাষী ছিলেন মোট 11.69 কোটি (32.4%) তার পরই আসছেন তেলেগু ও বাঙ্গালী। এঁরা সংখ্যায় যথাক্রমে 3.30 কোটি (9.1%) ও 2.51 কোটি (3.9%) ছিলেন। 1951 সনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা 30·36 কোটি অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা 84 জন হিন্দু। এর পরই আসেন মুসলমানগণ—এরা মোট জনসংখ্যার শতকরা 9.8 ভাগ। এছাড়া এদেশে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মাবলম্বীর বাস রয়েছে।

1951 সনের পর ক্রমশঃ ভারতের লোকগণনা পদ্ধতিকে আরও উন্নততর করার প্রয়াস নেওয়া হয়। স্বভাবতঃই দশ বৎসর অন্তর লোকগণনার মাধ্যমে যদি বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায় তবে পরবর্তীকালে পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজে যথেষ্ট সুবিধা হবে মনে করা হয়। কিন্তু লোকগণনাকে বিজ্ঞানসম্মত করতে গেলে বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন স্থানের তথ্যের যাতে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর হয় সেজন্য বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। প্রশ্নসূচী যাতে সুসংবদ্ধ হয় তাও দেখা উচিত। 1961 সনের লোকগণনার আগে তাই নানাস্তরে বহুরকম আলোচনা করে লোকগণনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। 1961 সনেই প্রথম গৃহসূচী (হাউসহোল্ড সিডিউল) প্রবর্তিত হয় এবং এই সূচীর সাহায্যে গৃহের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। জমির মালিকানা ও ভূমি ব্যবস্থার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। আবার শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিককেও গৃহভিত্তিক এবং অন্যান্য কারিগরী শিল্প এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

1971 সনেও লোকগণনার পূর্ববর্তী আলোচনা, গবেষণা চলেছিল। কমপ্যুটরের সাহায্যে তথ্যকে সুসংবদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়। জেলাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন ও মানচিত্র রচনা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি এই লোকগণনায় যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। তবুও সব দিক থেকে বিচার করতে গেলে 1961র কার্যসূচী যেন আরও ব্যাপক ছিল। 1981 সনের লোকগণনা কালেও প্রশ্নসূচী নিয়ে পর্যালোচনা চলে। 1974 সনে প্রথম লোকগণনার তথ্য ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু। তারপর 1976, 78, 79, 80তে নানা স্তরে যাঁরা লোকগণনা পর্যালোচনা করবেন, যাঁরা তাত্ত্বিক দিথকে কে

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যাঁরা এইসব তথ্য ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে ঘন ঘন বৈঠক বসে। প্রশ্ন তালিকা কেমন হবে, কোন কোন বিষয়ে জোর দিতে হবে, কোন কোন বিষয়ের বাদ দেওয়া চলে সবই এই সব সম্মেলনে আলোচিত হয়েছিল। যেমন 'কর্মী' সংজ্ঞা নিয়ে 1951 সন থেকে রদবদল চলে আসছে। '1951 সনে লোকেরা স্বনির্ভরশীল কিনা এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা খুব লাভজনক হয়নি। 1961 সনে 'কর্মী'র আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা প্রবর্তনের চেষ্টা হ'লেও সে প্রচেষ্টাটি তেমন দৃঢ় ছিল না। 1971 সনে দৃঢ় সংজ্ঞা নির্ধারণ করার ফলে 1961 ও 71 এর তথ্যের তুলনা করা কঠিন হয়ে উঠল। 1981 সনে এই সংজ্ঞা নির্ধারণের উপর তাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় ও পেশার শ্রেণীবিভাগেরও পরিবর্তন করা হয়।

1961 ও 71 সনে পেশাকে নয়ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—কৃষক, কৃষি শ্রমিক অন্যান্য কৃষি সম্পর্কযুক্ত কাজ যেমন পশুপালন, মাছ ধরা ইত্যাদি, খনি, শিল্প, শিল্পের আবার দুটি অংশ গৃহভিত্তিক শিল্প ও অন্যান্য শিল্প, নির্মাণকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য যানবাহন ও যোগাযোগ এবং অন্যান্য কাজ। [i) **Cultivator, ii) Agricultural labour, iii) Livestock, Forestry Fishing, Hunting & Plantations, Orchards and allied activities, iv) Mining & Quarrying, v) Manufacturing Processing, Servicing & Repairs, (a) Houshold Industry, (b) Other than Household Industry, vi) Construction, vii) Trade and Commerce, viii) Transport, Storage and Communications, ix) Other Service**] 1981 সনে মাত্র চারটি শ্রেণী রাখা হয়—কৃষি, কৃষি শ্রমিক, গৃহভিত্তিক শিল্প ও অন্যান্য কাজ। [**i) Cultivators, ii) Agricultural labourers, iii) Household Industry, iv) Other workers**] ব্যক্তি বিশেষের নিযুক্তিগত অবস্থা দুভাবে নিরূপিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ লোকটির সাধারণ কাজের অবস্থা, অর্থাৎ যেদিন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তার পূর্ববর্তী 365 দিনের বেশীর ভাগ সময় লোকটি নিযুক্তিগত অবস্থা কি। দ্বিতীয়তঃ লোকটির বর্তমান কাজের অবস্থা অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের পূর্ব সপ্তাহের লোকটির নিযুক্তগত অবস্থা কি। 1961 ও 71 সনে উভয় প্রথাকেই একসাথে গ্রহণ করা হয়েছিল। 1981 সনে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল সাধারন অবস্থার হিসাব নেওয়া হয়।

1981 সনে নিযুক্তির অবস্থানুসারে কর্মক্ষম লোকদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। যারা লোকগণনার পূর্ববর্তী বছরে 183 দিন বা তারও বেশী কাজে নিযুক্ত ছিলেন তারাই প্রধান কর্মীগোষ্ঠী। যারা 183 দিনের অপেক্ষা কম দিন কাজে নিযুক্ত তারা প্রান্তিক

কর্মী। অন্যান্য সকলে অকর্মী। এই সংজ্ঞা নির্ধারণের ফলে 1981র প্রধান কর্মীদের সঙ্গে 1971 এর কর্মীদের তুলনামূলক আলোচনা করা যাবে। আবার 1981র প্রধান ও প্রান্তিক কর্মীদের সঙ্গে 1961র মোট কর্মীর তুলনা সম্ভবপর হবে। সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে তিনটি আদমসুমারী তথ্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ও পরস্পরের তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটি অসুবিধাজনক। নমুনা সমীক্ষায় যেমন কর্মীগোষ্ঠী, বেকার, অকর্মীর দৃঢ়বদ্ধ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয় এক্ষেত্রেও তা বাঞ্ছনীয়।

আরেকটি সংজ্ঞা 1981 সনে পূর্ববর্তী দুই লোকগণনার ধারণাকে নিয়েই নির্ধারণ করা হয়। সেটি হচ্ছে শহরাঞ্চলের সংজ্ঞা। 1961 থেকেই এই শ্রেণী বিভাগের সূত্রপাত। 1981র আদমসুমারীতে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিকে শহরের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

1) যেসব জায়গায় পৌরসভা রয়েছে বা পৌর অঞ্চল বলে নথিভুক্ত হয়েছে 2) অন্যান্য জায়গা যেগুলির নিম্নলিখিত বিশেষত্ব আছে (ক) ন্যূনপক্ষে 5000 লোকের বাস (খ) শতকরা 75 জন কর্মী অকৃষি কার্যে লিপ্ত (গ) বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ তে অন্ততঃ 400 জন।

বলতে গেলে 1981 সনে শহরাঞ্চলের সংজ্ঞা আগের মতন। শুধু কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজকে (যেমন পশুপালন, বাগান, মাছ ধরা ইত্যাদি) 1981 সনে অকৃষি কাজ বলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকায় তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর।

অতঃপর আমরা তিনটি লোকগণনা তথ্যের মূল বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারি। মোট জনসংখ্যার গঠন, বসতির ঘনত্ব, রাজ্যসমূহের মধ্যে জনবণ্টন এই তিনটি তথ্যই একের পর এক দেখা যাক। মোট জনসংখ্যাকে স্ত্রী / পুরুষ এবং শহরবাসী / গ্রামবাসী এই দুইভাগে ভাগ ক'রে পরের পাতায় শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপিত করা হ'ল।

জনসংখ্যার গাণিতিক বৃদ্ধির হার 1961-71 এর দশকে শতকরা 2.48 ভাগ ও 1971-81 এর দশকে শতকরা 2.50 ভাগ। ভারতের আয়তন 1981 সনের লোকগণনায় 3,287,263 বর্গ কিঃ মিঃ দেখানো হয়েছে। ভারত জনবহুল দেশ। এই তিনটি আদমসুমারীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বসতির ঘনত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। 1961, 1971 ও 1981 তে বসতির ঘনত্ব যথাক্রমে প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে 142,177,216 জন দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ভারতের সকল অংশের বসতির ঘনত্ব এক নয়। 1981র হিসাবে দিল্লী সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। এখানে প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে 4194 জন লোকের বাস,

সারণি 1 : 5

1961, 1971, 1981 র জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ

জনসংখ্যা (কোটি)

	1961	1971	1981
গ্রামবাসী			
পুরুষ	18·3	22·5	26·9
স্ত্রী	17·7	21·4	25·6
শহরবাসী			
পুরুষ	4·3	5·9	8·5
স্ত্রী	3·6	5·0	7·5
মোট জনসংখ্যা			
পুরুষ	22·6	28·4	35·4
স্ত্রী	21·3	26·4	33·1
সমগ্র জনসংখ্যা	43·9	54·8	68·5

আবার অপর সীমায় অরুণাচল-এ প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে মাত্র 8 জন লোক বাস করছে। বসতির ঘনত্ব অনুসারে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ভাগ করে দেখান হ'ল।

সারণি 1 : 6

বসতির ঘনত্ব অনুসারে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভাজন

জনসংখ্যা প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে

	100 জনের কম		100 জন থেকে 499 জনের মধ্যে		500 জন তারও উর্ধ্ব		মোট সংখ্যা	
	রাজ্য	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	রাজ্য	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	রাজ্য	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	রাজ্য	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
1961	7	3	14	2	—	4	21	9
1971	7	3	13	2	1	4	21	9
1981	6	3	14	2	2	4	22	9

বিঃ দ্রঃ—প্রথম দুই ক্ষেত্রে জম্মু কাশ্মীর অনুপস্থিত।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বসতির ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশী। রাজ্যগুলি বেশীর ভাগ মাঝারি বসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।

ভারতের মোট 22টি রাজ্য ও 9টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।* দেশের সামগ্রিক

* ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মিজোরাম ও অরুণাচল এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে।

আয়তনের মাত্র শতকরা 3.6 ভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। 1931র আদমসুমারীর তথ্য অনুযায়ী জনসমষ্টির আনুমানিক 1.42% অংশ ওই সকল অঞ্চলে বসবাস করে।

সারণি 1 : 7

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা 1981র আদমসুমারী

রাজ্য	আয়তন [হাজার বর্গ কিঃ মিঃ]	(মোট আয়তনের শতাংশ)	জনসংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
অন্ধ্র	275	8·36	535	7.82
আসাম*	79	2·40	199	2·90
বিহার	174	5 32	699	10·20
গুজরাট	196	5·96	341	4·97
হরিয়ানা	44	1·34	129	1·88
হিমাচল প্রদেশ	56	1·70	43	0·62
জম্মু ও কাশ্মীর	222	6.75	60	0·87
কর্ণাটক	192	5·84	371	5·41
কেরালা	39	1·18	255	3·72
মধ্যপ্রদেশ	443	13 48	522	7·61
মহারাষ্ট্র	308	9·42	628	9·16
মণিপুর	22	0·67	14	0-20
মেঘালয়	22	0·67	13	0·19
নাগাল্যাণ্ড	17	0·51	8	0·11
উড়িষ্যা	156	4·74	264	3·85
পাঞ্জাব	50	1·52	168	2·45
রাজস্থান	342	10·40	343	5·00
সিকিম	7	0·21	3	0·04
তামিলনাড়ু	130	3·95	484	7·06
ত্রিপুরা	10	0·30	21	0·31
উত্তরপ্রদেশ	294	8·94	1109	16·18
পশ্চিমবঙ্গ	89	2·74	546	7.97
কেন্দ্রশাসিত** অঞ্চলসমূহ	120	3 60	97	1·42
ভারত	3287	100.00	6852	99 94 (100)

* প্রক্ষিপ্ত হিসাব

** 1। আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 2। অরুণাচল 3। চণ্ডীগড় 4। দাদারা, নগর হাভেলী 5। দিল্লী 6। গোয়া, দমন দিউ 7। লাক্ষাদ্বীপ 8। মিজোরাম 9। পণ্ডিচেরী।

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে মধ্যপ্রদেশ সবচেয়ে বড়। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান সর্বাগ্রে। বিহার, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আয়তনে সিকিম ক্ষুদ্রতম, সিকিমের জনসংখ্যাও সবচেয়ে কম। বিভিন্ন রাজ্যে মোটামুটি জনসংখ্যা আয়তনের সঙ্গে সমপর্যায়ের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। কোনও কোন ক্ষেত্রে যেমন জম্মু কাশ্মীরে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা কম আবার বিহারে এর বিপরীত অবস্থা।

সারণি 1 : 8

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ[8]

ধর্ম	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)		জনসংখ্যার শতকরা হিসাব	
	1961	1971	1961	1971
হিন্দু	3664	4533	83·4	82·7
মুসলমান	469	614	10 7	11·2
ক্রীশ্চান	107	142	2·4	2·6
শিখ	78	104	1·8	1·9
বৌদ্ধ	32	38	0·7	0·7
জৈন	20	26	0·5	0·5
অন্যান্য	22	25	0·5	0·4
মোট জনসংখ্যা	4392	5482	100·0	100·0

ভারতের এইসব বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, যদিও অনেকগুলির উৎস সংস্কৃত ভাষা। আবার প্রত্যেক রাজ্যেই নানা ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। ভারতের আদমসুমারীতে প্রধান ধর্মানুসারে জনসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ করার প্রথা বহুদিন প্রচলিত। এসম্পর্কে 1961 ও 1971 এর তথ্য পূর্ববর্তী সারণিতে প্রকাশ করা হল।

ভারতের অধিকাংশ লোকই হিন্দু। তুলনামূলকভাবে '61 থেকে 71' সনের মধ্যে জনসংখ্যায় হিন্দুদের অংশ সামান্য হ্রাস পেয়েছে ও মুসলমানদের অংশ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। 1981 সনে ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে গৃহভিত্তিক সূচীর মাধ্যমে গৃহকর্তার ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যের সাহায্যে গৃহকর্তার ধর্মানুসারে গৃহের জনগণের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। উপস্থাপনা 1961, 1971 সনের চেয়ে কিছু ভিন্ন ধরনের। তবে যেহেতু গৃহবাসীরা গৃহকর্তার ধর্মাবলম্বীভাবেই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে পূর্বকালীন লোকগণনার তথ্যের সঙ্গে 81র লোকগণনার তথ্য তুলনীয়। 1981 সনে অবশ্য আসামের তথ্য সংগৃহীত হয়নি। যাই হোক মোট জনসংখ্যায়

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শতকরা হিসাব নিম্নলিখিতরূপ। হিন্দু (82.34%) মুসলমান (11.35%) খ্রীশ্চান (2·43%) শিখ (1·96%) বৌদ্ধ (0·71%) জৈন (0·48%) অন্যান্য ধর্ম (0·42%) ধর্ম জানা যায় নাই (0·31%)। দুটি প্রধান ধর্মাবলম্বী-দের বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আলোচনা করলে দেখা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশী। যেমন 1971-81 সনে বিহারে, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের থেকে বেশী।

নানাধর্মের মতন ভারতে নানাভাষা প্রচলিত। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই একটি নিজস্ব ভাষার ব্যবহার হয়। কোনও কোনও রাজ্যে একাধিক ভাষাও ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে একটি বড় অংশ হিন্দী ভাষাভাষী, মুসলমানদের মধ্যে উর্দু ভাষার চল রয়েছে। হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা 1961 থেকে 1971 এর মধ্যে শতকরা 30.4 থেকে 29.7 এ হ্রাস পেয়েছে। এই কালে পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষীর সংখ্যা শতকরা 7.7 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 8.2 তে উঠেছে। আদমসুমারী তথ্যে মোট 15টি ভাষাভাষী মানুষের হিসাব দেওয়া হয়। বাকী ভাষাগুলি একসাথে 'অন্যান্য ভাষা'রূপে সূচিত হয়। জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দী ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তারপর একাদিক্রমে আসে তেলেগু, বাংলা, তামিল, মারাঠী ভাষা। এই সব ভাষাভাষীরা সংখ্যায় শতকরা 7 থেকে 8 এর মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মিরী সিন্ধী ভাষাভাষী লোকসংখ্যা শতকরা 0·4 ; / 0·3 ভাগ।

এইভাবে নানা বৈচিত্র্যময় এই বিপুল জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে প্রতি দশ বৎসর অন্তর আদমসুমারীর তথ্য পরিবেশন একটি বিরাট কাজ। কিন্তু জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একমাত্র আদমসুমারীর উপর নির্ভর করলেই সবসময় সুফল পাওয়া যাবে এমন নয়। আদমসুমারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য। যেমন 1971 সনের সূচক দিন ছিল 1লা এপ্রিল। 1981 সনের সূচক দিন ছিল জম্মু কাশ্মীরে ৬ই মে ও অন্যত্র সবস্থানে 1লা মার্চ। 1971 সনে 10 থেকে 31 শে মার্চের মধ্যে লোকগণনা করা হয়। আবার এই তথ্যকে পরিমার্জিত আকারে সকলের ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য উপস্থাপিত করতেও অনেক সময় ব্যয়িত হয়। অধুনা কম্পিউটর যন্ত্রের ব্যবহার কিছু কিছু প্রচলিত হলেও প্রতিবেদন প্রকাশের সময় যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয়নি। তবে ভারতের আদমসুমারী একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ। এর আহরিত সম্পূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা আজ পর্যন্ত এদেশে হয়নি।

1.3 জনসংখ্যা তথ্য আহরণের বিভিন্ন উপায়

ভারতে জনসংখ্যা তথ্যের প্রধান উৎস দশ বৎসর অন্তর আদমস্থমারী। এছাড়া রয়েছে সিভিল রেজিষ্ট্রেশন, নমুনা রেজিষ্ট্রেশন প্রথা ও জাতীয় নমুনা সমীক্ষা। এছাড়া নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে ছোট, বড় গবেষণা কার্য চালিয়ে ও স্থানীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ ক'রেও নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানা হয়ে থাকে। দশ বৎসর অন্তর লোকগণনার দ্বারা জনসংখ্যার আয়তন, বয়স বিস্তারিত গঠন, স্ত্রী পুরুষ অনুপাত, ধর্ম, ভাষা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন প্রভৃতি তথ্য আহরিত হয়। লোকগণনার কার্যটি সম্পন্ন করে অসংখ্য প্রাথমিক শিক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের কর্মীরা। এঁদের এই কাজের জন্য সামান্য ভাতা দেওয়া হয়। এই কার্য পরিচালনার ভার থাকে সরকারী শাসনযন্ত্রের উপর। বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এইসব বিভিন্ন স্থানে তথ্যগুলি একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা হয়। এই বিশাল পরিমাণ তথ্য এইভাবে পরিবেশিত হওয়ার ফলে স্থানে স্থানে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জনসংখ্যা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য পরিবেশনে এই প্রথা নির্ভরযোগ্য। আদমস্থমারীর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত করা হয়।

জনসংখ্যা গতিশীল—এই গতিশীলতার অনুধাবন করতে হ'লে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। জন্ম মৃত্যুহার বা সংজনন হারের সাহায্যে গতিশীলতা বোঝা যায়। কিন্তু আদমস্থমারীর তথ্যের সাহায্যে এইসব পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা করা সহজ নয়। জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ভারতে 1876 সন থেকে সিভিল রেজিস্ট্রেশন প্রথা বলবৎ আছে। কিন্তু লোকে জন্ম মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত করতে নানা কারণে অপারগ। তাই এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও এই সব তথ্য একেবারেই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। মহারাষ্ট্রে গুজরাটে, তামিলনাড়ুতে ও পাঞ্জাবে এই প্রথা কিছুটা দৃঢ়ভাবে চালু আছে। যাই হোক জন্ম মৃত্যু নথিভুক্ত করলে জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। সেজন্য ভারতে 1969 সনে রেজিষ্ট্রেশন অব্ বার্থস এ্যাণ্ড ডেথ এ্যাক্ট পাস করা হয়। এর ফলে জন্মমৃত্যু নথিভুক্তীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। তবু এই প্রথা এদেশে ঠিকমত চালু করা সময় সাপেক্ষ।

তবে 1950 সন থেকে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সাহায্যে জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আহরণের প্রথা চলে আসছে। এই সংস্থা 1958-59 সন থেকে 1968-69 সন এর মধ্যে 14 থেকে 23 পর্যায় সমীক্ষা চালিয়ে জন্ম মৃত্যু সম্পর্কিত বহু তথ্য সংগ্রহ করে। তবে এই ধরনের সমীক্ষার সময়কাল দীর্ঘ হয়। যাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁকে

অতীত দিনের হিসাব দিতে হয়। অনেক সময় ঠিকমত মনে ক'রে তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় না।* উন্নত দেশে পঞ্জীয়ন দপ্তরেই জন্ম মৃত্যু সংক্রান্ত সঠিক তথ্য মেলে। কিন্তু ভারতে শতকরা 80 ভাগ লোক গ্রামের অধিবাসী। সেখানে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন দৃঢ় নয়, যে জনসাধারণ সহজে জন্ম, মৃত্যু রেজিস্ট্রী করতে পারবে। আবার এইভাবে তথ্য নথিভুক্ত করার গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল নয়। সুতরাং জীবনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখানে এখনও গড়ে ওঠেনি। 1969 সনের আইন প্রণয়নের পর এ ব্যবস্থাকে জোরদার করা হচ্ছে। তবে এখনও জনসংখ্যার স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন, ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপ, পরিকল্পনা নীতির কার্যকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সিভিল রেজিষ্ট্রেশন বা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে কোনটি পুরোপুরি প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না।

নমুনা পঞ্জীয়ন পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমস্ত জীবনসংক্রান্ত ঘটনা একজন স্থানীয় তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ত সংগ্রহ করে চলেন। ছ' মাস অন্তর একজন উচ্চতর কর্মচারী এই তথ্যর পুনঃ পরীক্ষা করে থাকেন। একই সময়ের তথ্য তাহ'লে সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা থাকছে। আবার সেই তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হ'ল কিনা এটা কিছু সময় বাদে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ফলে এইভাবে তথ্য যদিও অল্প পরিসর স্থানে সংগ্রহ করা হচ্ছে তবুও নির্ভরযোগ্য হবে।

1964-65 সনে ভারতে সর্বপ্রথম মাত্র সাতটি রাজ্যে এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এই পদ্ধতির সাহায্যে জীবন সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে মোট 2412টি ও শহরাঞ্চলে মোট 1268টি নমুনা কেন্দ্রে এই কাজ চালান হয়। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা 0.7 ভাগ ও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা 1.0 ভাগ এই সমীক্ষার আওতায় আসছে।

যতদিন পর্যন্ত এদেশের সাধারণ পঞ্জীয়ন প্রথার জাল দেশের চতুর্দিকে বিস্তৃত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নমুনা পঞ্জীয়ন ও নমুনা সমীক্ষার সাহায্যে জীবন সংক্রান্ত তথ্যের ধারণা করতে হবে। তবে নমুনা পঞ্জীয়নের সাহায্যে শুধু জন্ম, মৃত্যু গণনা করাই ভাল। একে অন্য নানাদিকে তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগান সুবিধাজনক নয়। পরিবার পরিকল্পনার ফলাফল, মৃত্যুর কারণ, নানা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয়েও সর্ব ভারতীয় তথ্যর প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে নমুনা সমীক্ষা বেশী কার্যকরী হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান তার 28 পর্যায়ের সমীক্ষায় এই ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে। দশ বৎসর

* নমুনা সমীক্ষাতে জন্মমৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য একটু কমের দিকে আসার সম্ভাবনা থাকে ;

অন্তর জনসংখ্যা সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের এদের একটি কার্যসূচী আছে। যদি দুই আদমসুমারীর মধ্যবর্তী সময়ে এই ধরনের সমীক্ষা গ্রহণ করা হয় তবে তা খুব কার্যকরী হবে।

এই সমস্ত স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা সম্বন্ধে অনেকসময় অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়, রকফেলার সংস্থা ও ভারত সরকারের উদ্যোগে উত্তর পাঞ্জাবের জনসংখ্যার বিশদ সমীক্ষা ক'রে 1971 সনে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ইউ, এন, ও' র [U. N. O.] সহযোগিতায় ভারত সরকার মহীশূর সম্পর্কেও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জনসংখ্যা গবেষণা সংস্থা নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনসংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য আলোচনা ক'রেও সীমিত প্রতিবেদন প্রকাশ ক'রে থাকেন। এই সমস্ত প্রতিবেদন হয়ত জনসংখ্যা নীতি গ্রহণের সময় উপযুক্ত দিক নির্ধারণের সহায়তা করে।

জনসংখ্যার সামগ্রিক দিক ও জীবনসংক্রান্ত ঘটনার তথ্য এইভাবেই সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানা সময় নানা তথ্যের প্রয়োজন হয়। যেমন, স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য—বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসকের সংখ্যা; প্রভৃতি বিষয়ে জানা থাকলেই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পিত কর্মসূচী হাতে নেওয়া যায়। তেমনি শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা দরকার। লোকগণনার মাধ্যমে দশ বৎসর অন্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বাক্ষরতার হার জানা যায়। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আর কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না।

আরও একটি তথ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন সেটি হ'ল বেকার ও কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা জানা। শুধু তাই নয় দেশের কর্মসংস্থানের রূপ কিরকম অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় কত লোক নিযুক্ত তাদের মধ্যে কতজন সবসময় কাজ করে, কতজন সময় সময় কাজ পায় এই সব তথ্যও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। লোকগণনার সময়ে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কিন্তু কর্মসংস্থান এমন একটি জাতীয় সমস্যা যে এ সম্পর্কে বিশেষ ধরনের তথ্য সংগ্রহ না করলে সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে।

জনসংখ্যার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ উদ্যোগী। আবার কিছু কিছু বিশেষ সংস্থাও এজন্য গড়ে তোলা হয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার জন্য রাজ্য পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোনও সংস্থা গড়ে ওঠেনি। কোন কোনও রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে একটি ইউনিট এই কাজ করে। কোথাও আবার অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত দপ্তরই একাজ

করে থাকে। জিলা পর্যায় স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থাই নেই। জিলা পরিবার পরিকল্পনা সংস্থায় এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন পরিসংখ্যান কর্মী থাকেন। ব্লক পর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রেও কেবল পরিবার পরিকল্পনা পরিসংখ্যান সংরক্ষণের জন্যই একজন কনিষ্ঠ কর্মী রয়েছেন। অথচ স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ও তার ফলাফল কি হ'ল এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থা নেই। দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার কি সুযোগ সুবিধা আছে অর্থাৎ জায়গায় জায়গায় হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র কতটি রয়েছে, তাদের শয্যা সংখ্যা কত এসমস্ত বিষয় তথ্য অবশ্য জেলা পর্যায় সংগ্রহ ক'রে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে সংকলিত হয়।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনায় অবশ্যই রোগ ও মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে মৃত্যুর হার নির্ধারণ এখন নমুনা পঞ্জীয়ন রীতিতে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। কিন্তু কারণ অনুসারে মৃত্যু তথ্য বিভাজিত করতে পারলে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। মৃত্যুর কারণ অনুসারে মৃত্যু হার পরিমাপ করার জন্য বিশেষ ধরনের পঞ্জীয়ন প্রথা (মডেল রেজিষ্ট্রেশন প্রথা) প্রবর্তিত হয়েছে। নমুনা পঞ্জীয়ন রীতিতে যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে নমুনা নির্ধারিত হয়েছিল এক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। যেসব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত আধা-চিকিৎসক কর্মচারী রয়েছে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। এরা কি কারণে ক'টি মৃত্যু ঘটল তার হিসাব দাখিল করবে। এই হিসাবের শতকরা দশভাগ চিকিৎসক পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। এই প্রথার সাহায্যে কিছু তথ্য সংগৃহীত হলেও এটি ত্রুটি শূন্য নয় এবং এর বহুল প্রচার নেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রক পরিসংখ্যান পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রধানতঃ রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষা দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পরিসংখ্যান সংগ্রহ ক'রে থাকেন। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থাও এ ব্যাপারে অগ্রণী। এছাড়া সরকার যেসব শিক্ষাকমিশন গঠন করেছেন তাঁরাও অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রে প্রতিবেদন পেশ করেছেন। কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের পরিসংখ্যান বর্তমানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। (1) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমেত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (2) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমেত মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (3) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সমেত মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা (4) শিক্ষা খাতে ব্যয় (5) বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল। সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে পৃথকভাবে পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা হয়।

দেশের কর্মক্ষম মানুষ ও তাদের মধ্যে কতজন কাজ করতে ইচ্ছুক এই তথ্য দুটি কর্মসংস্থানের যেকোনও পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য জানা অবশ্য প্রয়োজন। আবার যারা কাজে নিযুক্ত আছে তারা কি ধরনের কাজ করছে, বছরের সবসময় কাজে লিপ্ত আছে কিনা এগুলিও প্রয়োজনীয় তথ্য। মনুষ্য সম্পদের প্রাথমিক তথ্যের যোগানদার আদমস্থমারী। শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য থেকেও কোন কাজে কিরকম কর্মক্ষম ব্যক্তি আসতে পারে তার একটা আভাষ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের লোক বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকে। তাই নানা সংস্থা, নানা কর্মীগোষ্ঠীর হিসাব দেয়। যেমন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার বাৎসরিক শিল্প সমীক্ষা থেকে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ের গবেষণা সংস্থায় বিভিন্ন প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ কর্মীদের হিসাব রাখে। কৃষি গবেষণা সংস্থায় কৃষি বিজ্ঞানীদের সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মদক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম। এদের সম্পর্কে তথ্য নির্দিষ্ট সংস্থা সংগ্রহ ক'রে। তবে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের কার্যসূচী গ্রহণের জন্য বেকারত্বের সঠিক হিসাব করা মুস্কিল। স্থানীয় পর্যায় এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করলে ভাল হয়। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এখন অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মনুষ্য সম্পদের সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্লক পর্যায় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিছু কিছু কাজে লাগান হয়েছে। ধারাবাহিক লোকগণনার সাহায্যে জনসংখ্যার আয়তন, গঠন, সাধারণ শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি মূল তথ্যই পাওয়া যায় বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন বিধেয়।

1. 4. 1981 সনের লোকগণনার পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম যোজনাকাল (1985-90)

বর্তমান ভারতে সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত্তি রচনা ক'রে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান। যদিও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও উপস্থাপনার নানা সংস্থা এখন এদেশে কাজ করে যাচ্ছে, মুখ্য পঞ্জীয়ন দপ্তরের এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এদেশে একশত বৎসর কাল ধারাবাহিক লোকগণনার রীতি প্রচলিত। ব্রিটিশ সরকার এই তথ্যকে শাসনকার্যের প্রয়োজনে সংকলিত করতেন। সময়ে সময়ে রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ, অনগ্রসর স্থান চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি কাজেও লোকগণনা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার নব রূপায়ণের কথা বিদেশী সরকার চিন্তা করেননি। যে দেশের শাসনভার তাদের হাতে রয়েছে সে দেশের লোকেদের সম্বন্ধে কিছু জানা—এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই ব্রিটিশ ভারতের লোকগণনা সংগঠনের মধ্যে কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব ছিল।

স্বাধীনতা লাভের পরে 1951 সনে পরিকল্পনার কার্যসূচী গ্রহণ করার ফলে আদম-

সুমারীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রয়োজন হ'ল। দশ বৎসর অন্তর শাসনযন্ত্রকে হঠাৎ একবার সংগঠিত ক'রে খেয়ালখুশি মতন কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে না। পরিকল্পনার অর্থ অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে যাচাই করে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ। আদমসুমারী অতীতের তথ্যকে পরিকল্পনাবিদদের কাছে তুলে ধরবে। আবার এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে কার্যসূচী নেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময় বাদে তার কি ফললাভ হ'ল সেই তথ্য পরবর্তী আদমসুমারীর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। যেমন বিগত দশকগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তথ্য আদমসুমারীর কল্যাণে আমাদের জানা আছে। সেই তথ্য নির্ভর ক'রে আমরা ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপ করতে পারি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে বৃদ্ধির হার কমে যাবে। এই হারেও ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপ করা সম্ভব। পরবর্তীকালে যখন পুনরায় লোকগণনা করা হয় তখন প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার সঙ্গে নতুন ফলাফলের তুলনা করা চলে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কতটা কার্যকরী হ'ল তাও বোঝা যায়। 1971-81-র দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বাৎসরিক শতকরা 2.5 ভাগ। সপ্তম পরিকল্পনা কালে অর্থাৎ 1985-90-তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাৎসরিক শতকরা 1.87 ধরে নিয়ে 1990 সনে মোট জনসংখ্যা 80.3 কোটিতে দাঁড়াবে স্থির করা হয়েছে। তাহলে ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনার ফলে জনসমষ্টির হিসাবে মাথাপিছু আয় কি হবে তাও স্থির করা সম্ভব। 1991-এর আদমসুমারীর সাহায্যে এই তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই করা যাবে। ভারতের প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই জনসংখ্যা তথ্য থেকে জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার এ দুটি তথ্য নিয়ে মাথাপিছু আয়, ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধারণাগুলি কিন্তু তেমন সঠিক হয়নি। প্রথম পরিকল্পনায় হ্যারড-ডোমার-মডেলের সাহায্য বিনিয়োগ আয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেখান হয় যে বাৎসরিক শতকরা 1.25 হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় 1977 সনে 1950-51 সনের দ্বিগুণ হবে। 1941-51-তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে প্রথম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় আরও বলা হয় যে বিনিয়োগের হার 1950-51 সনে শতকরা 5 ভাগ থাকছে। প্রথম পরিকল্পনা কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে 7 ভাগে দাঁড়াবে। এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা 11 ভাগে বৃদ্ধি পাবে। 1967-68 সনে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের শতকরা 20 ভাগ হয়ে স্থিতাবস্থায় আসবে। 1951-61 সনে জনসংখ্যা বাৎসরিক গড়পড়তা শতকরা 2 ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাথাপিছু আয়ের হিসাব টেঁকেনি। যাই হোক পরবর্তী পরিকল্পনাতেও জনসংখ্যা প্রক্ষেপের এই ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। যেমন খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনাতে ধারণা করা হয় 1971-76 সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2-এর সামান্য ওপরে থাকলেও 1971-81-তে তা হ্রাস পেয়ে 1.68-এ

এসে দাঁড়াবে। 1981 র লোকগণনা তথ্যে এই পরিমাপ গ্রহণযোগ্য নয় দেখা গেছে। জনসংখ্যার আয়তন বা পরিবর্তনের হার প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার বিবর্তনের সবদিকে দৃষ্টি রাখা বোধ হয় সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না বলেই বৃদ্ধির হারের পরিমাপ সঠিক হয়ে উঠে না। সপ্তম যোজনা কালের পরিমাপকে সঠিক প্রমাণ করতে হ'লে যে উপায়ে বৃদ্ধির হার কমানোর কথা চিন্তা করা হয়েছে তাকে কার্যকরী করতে হবে।

মোট জনসংখ্যা ছাড়া আদমসুমারী আরও অনেক তথ্য কাজে লাগান যেতে পারে। যেমন শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য। প্রতি রাজ্যের স্ত্রী, পুরুষের স্বাক্ষরতা হারের হিসাব এতে প্রকাশিত হয়। আবার মোট জনসংখ্যাকে শিক্ষান্তর হিসাবে বিভাজিত করে দেখানো হয়। 1961র লোকগণনায় পুরুষ ও স্ত্রীর স্বাক্ষরতার হার যথাক্রমে শতকরা 34 ও শতকরা 13 দেখা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই স্ত্রী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

অনগ্রসর গোষ্ঠী যেমন তপশীল জাতি উন্নতিকল্পে বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়। 1951 সন থেকে এদের পৃথক হিসাব নেওয়া হচ্ছে। এই আদমসুমারীতে শুধু মোট জনসংখ্যা জানতে পারা যায়। 1961 সন থেকে এদের সম্বন্ধে আরও বেশী তথ্য প্রকাশিত হয়। 1971 ও 1981 সনে এই তথ্য আরও বিশদ করা হয়েছে। এখন এদের ক্ষেত্রে কি ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যসূচী নেওয়া হবে তা এদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেই স্থির করতে হবে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতন এদেশে বিভিন্ন এলাকাও অনগ্রসর। দেশটি গ্রামপ্রধান এবং অনেক গ্রামে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য কোনও রকম উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নেই। শহরগুলিও পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। কোন কোন অঞ্চলকে শহর পর্যায়ভুক্ত করা যাবে তাও বিচার সাপেক্ষ। 1961, 1971 ও 1981 সনের আদমসুমারীতে শহরাঞ্চলের সংজ্ঞা স্থির করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা এই সব শহরের মধ্যেই নেওয়া হয়ে থাকে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার কথা তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনা কালে অনেক বলা হয়েছে। কিন্তু 1961 সনে বিভিন্ন অঞ্চলের 'উন্নয়নের স্তর' সম্পর্কিত তথ্যকে উপযুক্ত-রূপে ব্যবহার ক'রে কোনও পরিকল্পনা রচনা করা হয়নি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিকল্পনার জন্য আদমসুমারীর তথ্যের সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন—সেটি হ'ল কর্মসংস্থান। কিন্তু দেশে কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক লোকসংখ্যা, তার বৃদ্ধির হার ও বেকারের সংখ্যা নির্ধারণ এখনও পর্যন্ত আদমসুমারীর মাধ্যমে করা

সম্ভব হয়নি। অথচ প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই বেকার সংখ্যার হিসাব করার চেষ্টা হয়। আদমসুমারীর ক্ষেত্রে এর প্রধান অসুবিধা হ'ল সংজ্ঞাগত। 1961 ও 1971 এর তুটি সংজ্ঞার মধ্যে এতই অসংগতি এসে পড়ে যে তথ্যের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। 1981 সনে সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন সাধন ক'রে তথ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আদমসুমারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য দিচ্ছে। কর্মসংস্থান পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতে গেলে ক্রমান্বয়ে বেকারীর তথ্য সংগ্রহ করে যেতে হবে। সংগঠিত পেশাগুলির ক্ষেত্রে অনেকাংশে তা সম্ভবপর হ'লেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে আদমসুমারী ভরসা। আর ভারতের বেশীরভাগ লোকই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর 1951 থেকে 1981র মধ্যে ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আদমসুমারীতে যে বিশাল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে পরিকল্পনায় তার উপযুক্ত ব্যবহারের নজির নেই। অবশ্য আদমসুমারীর তথ্য উপস্থাপনে বিলম্ব ঘটে। আবার পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বেশী সুবিধাজনক মনে করেন। এইসব তথ্যগুলি সমসাময়িক হয়। তবুও আদমসুমারীর পরিসংখ্যানের ব্যাপকতা অন্য কোনওভাবেই মেলা সম্ভবপর নয়।

1981 সনের ভারতের লোকসংখ্যা 68.5 কোটি ছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতে 1984 সনে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা 74·6 কোটি (2% বৃদ্ধির হার ধরে নিয়ে)। 1985 সন থেকে সপ্তম পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু। এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় 3,20,000 কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার 26 শতাংশ। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 1,80,000 কোটি টাকা। এই বরাদ্দই সঠিক মতে পরিকল্পনার আয়তন।

এই বৃহৎ জনসমাজে পরিকল্পিতভাবে এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে কিছুটা অগ্রগতি আসবে সন্দেহ নেই। 1981 সনের আদমসুমারীর অনেক তথ্যই সংকলিত হয়ে আসছে। তাছাড়া রাজ্যভিত্তিক অসংকলিত তথ্যও প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যায়। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনায় এই তথ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থান কার্যসূচীতে বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক কর্মীর তথ্যটি কাজে লাগান যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে 5 থেকে 24 বছরের ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে বয়স ও শিক্ষাস্তরকে তুই দিকে নির্দেশিত করে সারণি রচনা করলে শিক্ষা-বিস্তার কি পরিমাণ হয়েছে, কারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে জানা যায়। এই তথ্য ভিত্তি ক'রেই শিক্ষার কোন স্তরে বেশী জোর দিতে হবে তাও বোঝা যায়। 24 বৎসরের ঊর্ধ্বে স্ত্রী পুরুষের

স্বাক্ষরতার হার তথ্য আবার বয়স্ক শিক্ষা প্রসার কর্মসূচীর কোথায় কতটা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবে।

তপশীল জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের বিশেষ সুবিধা দান কর্মসূচী কি ধরনের নিতে হবে সেক্ষেত্রেও 1981 সনে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মসংস্থান, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি ইত্যাদি কেমন ছিল সেগুলি ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হ'তে পারে। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা কি হারে বাড়ছে, কত নতুন অঞ্চল শহরে পরিণত হচ্ছে এই সব তথ্য নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে লাগবে। আবার গ্রামের পানীয় জল, পথঘাট, যাতায়াত ব্যবস্থার সম্বন্ধে ধারণা করতে হলেও আদমসুমারী ভরসা। সপ্তম পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলাভিত্তিক, ব্লকভিত্তিক পরিকল্পনা করতে গেলে প্রথমেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা হ'ল উপযুক্ত পরিসংখ্যান। যে এলাকার সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে হবে তাতে কি কি সুবিধা আছে তারই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করবে আর কি কি সুবিধা গড়ে তুলতে হবে। আদমসুমারী একমাত্র স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনার ভিত্তি রচনার জন্য যেসমস্ত তথ্যের প্রয়োজন তা সরবরাহ করতে পারে। তাই সর্ব নিম্ন স্তরে (grassroot level) এ পরিকল্পনা করতে হ'লে আদমসুমারী একমাত্র ভরসা। 1981র জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন সপ্তম যোজনার একটি প্রয়োজনীয় আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য—S. N. Agarwal—India's Population Problem
2. দ্রষ্টব্য1—1এর অনুরূপ
3. দ্রষ্টব্য—Prof. P. C. Mahalanobish and Sri Durga P. Bhattacharyya—Growth of Population of India & Pakistan 1801—1961—I.S.I. September—1969
4 দ্রষ্টব্য—H. V. Parry (ed) Population and its problems.
5. দ্রষ্টব্য—3এর অনুরূপ
6. দ্রষ্টব্য—4এর অনুরূপ
7. দ্রষ্টব্য—Basic Statistics relating to Indian Economy Vol. I, August 1982 (Economic Intelligence Service, Centre for Monitoring Indian Economy, Bombay)

8. দ্রষ্টব্য—7এর অনুরূপ

9. দ্রষ্টব্য – 7এর অনুরূপ

10. বিশেষ দ্রষ্টব্য সারণি 1.5, 1.6 ও 1.7 এবং 1951, 1961, 1971, 1981 আদমসুমারীর যাবতীয় তথ্য যেগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ নেই সবগুলি Final Population totals 1961, Paper No. 1 of 1962, Final Population totals 1971, Paper No I of 1972, Final Population totals 1981, Paper No 1 of 1982, Primary Census Abstract of General Population Part II B (i) 1981 census এই কয়টি প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জনসম্পদ

2.1 জনজীবনের পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক প্রগতি

ভারত তার বিশাল জনসমষ্টির জন্য পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়াসী। ভারতের মতন আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশও এই একই লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করছে। তাদের সামনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। সবদেশের উন্নতির মূলেই রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু-ব্যবহার। এর জন্য চাই উপযুক্ত বিনিয়োগ শ্রম ও কলাকৌশল।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলতে গেলে আমরা প্রথমেই সে দেশের মোট উৎপাদন ও মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক তালিকার দিকে নজর দিই। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য যেমন সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে তেমনি দেশের জনসংখ্যার দিকে নজর রাখতে হবে।

মনুষ্য সমাজ গতিশীল, এখানে সবকিছুই দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের আচার ব্যবহার সামাজিক রীতি নীতি পাল্টাচ্ছে। নতুন নতুন ভোগ্য পণ্য আসছে। উৎপাদনের কলাকৌশল বদলে যাচ্ছে। এ সব কিছুই প্রগতির লক্ষণ।

অতীতের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী নাকি খুবই সহজ ছিল। খাদ্য আহরণ ও বংশ বৃদ্ধি প্রাণীজগতের এই দুটি কর্মধারার মধ্যেই তারা নিজেদের আবদ্ধ রাখত। সেই যুগের জীবনযাত্রা প্রণালী আমাদের কাছে অজানা। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে মানুষ দীন হীনভাবেই তখন জীবনযাপন করত। আসলে অর্থনৈতিক প্রগতির ধারণাই তার ছিল না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যাযাবর ছিল। একজায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার তার কোনও আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তার ভ্রমণের পরিধি স্বল্পায়ত ছিল। পরবর্তী যুগে কৃষি উৎপাদন ও স্থায়ীভাবে বসবাসের অভ্যাস একই সাথে গড়ে উঠল। এটি জন-জীবনের প্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ যন্ত্রপাতির

ব্যবহার শিখল। কৃষি থেকে ধীরে ধীরে নানা শিল্পে প্রসার লাভ করল। নানা ধরনের শক্তির ব্যবহারের ফলে শিল্প, যোগাযোগ ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হ'ল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আর নিজের নিজের দেশে আবদ্ধ রইল না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়তে থাকল। ফলে পৃথিবীব্যাপী সর্বত্রই এক উন্নত জীবন গড়ে তোলার সাড়া জেগে উঠল।

উন্নত জীবন গড়ে তুলতে হ'লে আয় ও ভোগ বৃদ্ধি করতে হবে। খাওয়া, পরা, বাসস্থান এই তিনটি মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় জিনিসের নানাপ্রকার ভেদ আছে।

এছাড়া বহু আরাম ও বিলাস সামগ্রী আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। উন্নত জীবন যাপন ক'রে মানুষের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চলেছে মানুষের নানান কর্মপ্রচেষ্টা। সমুদ্রের তলদেশ মহাশূন্য কিছুই মানুষের কাছে এখন অনধিগম্য নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলেই সার্বিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে।

মনুষ্য সমাজের এই পরিবর্তনের ধারা অবশ্য সারা বিশ্বে একইভাবে প্রবহমান নয়। এক দেশ এক সময়ে উন্নত হয়েছে—তারপর তার প্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। অপর এক দেশ অগ্রগামী হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যথেষ্টই পাওয়া যাবে। আবার এক দেশের অগ্রগতি মানে সেদেশের জনসাধারণ সকলেই সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়েছে এমন নয়। তবে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যে সব দেশই অর্থনৈতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আগ্রহশীল। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের কথা জানতে পারছে। তার ফলেই এ ধরনের চেতনা গড়ে উঠেছে।

বর্তমান যুগের উন্নত দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি বলতে ঠিক কি বোঝা যায় যে সম্পর্কে নানা মত গড়ে উঠছে। এখন যদি কোনও দেশে আয় ও জনসংখ্যা সমান হারেই বাড়ে ও মাথাপিছু আয় অপরিবর্তিত থাকে সে দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটেছে মনে করতে হবে।

সাধারণতঃ অর্থনৈতিক প্রগতির আলোচনার সময় জনসংখ্যার পরিবর্তনের কথা পৃথকভাবে বলা হয় না। কিন্তু তার ফলে দেশের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না। কোনও দেশে হয়ত নতুন সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হ'ল। কিন্তু জনসংখ্যাও সাথে সাথে বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত উৎপাদন বাড়তি লোকের ভরণপোষণে ব্যয়িত হবে। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ ঘটবে না। যখন কোনও দেশের উৎপাদন

ক্ষমতা জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ে তখন মাথাপিছু আয় বাড়ে ও সঞ্চয় বাড়বার সম্ভাবনা বেশী হয় ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটতে পারে।

অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে জনজীবনে নানাদিকে পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্যক্তিগত আয় বাড়ে ও দেশে নানা ধরনের ভোগ্য পণ্য উৎপাদিত হয়। এইসব পণ্য মানুষের ব্যবহারে আসে। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। এই স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্য লোকে পরিবার সীমিত রাখতে ইচ্ছুক হয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ ক'রে। ফলে বৃহৎ পরিবার সৃষ্টি করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। অর্থ-নৈতিক উন্নতির সঙ্গে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পায়। পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্যের মনোভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। ডিভোর্স প্রথা চালু হওয়ায় বিবাহিত জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হয়। জনজীবনের ও জনমানসিকতার এই ধরনের পরিবর্তনের প্রভাব জনসংখ্যার উপর এসে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক প্রগতির সূচনা তা কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হয়নি। দেশের জনসাধারণের মধ্যেই কিছু সংখ্যক লোক উদ্যোগী হয়ে শিল্প ক্ষেত্রে কিছু নতুন কলাকৌশলের প্রবর্তন ক'রে। সেগুলি কাজে লাগিয়ে নানভাবে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জনসংখ্যার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা দেয়। পরবর্তীকালে এই বিষয়টিকে ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই এই বিবর্তনবাদ রচিত। বর্তমান যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও জনসংখ্যার ধারা একই পথে চলেছে বলে অনেকে বিশ্বাসী। এই মতবাদ অনুসারে কোনও দেশের জনসংখ্যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি নির্দিট নিয়মে পরিবর্তিত হয়। একটি অনুন্নত, গতিহীন সমাজে জনসংখ্যাও স্থিতিশীল থাকে। এই ধরনের সমাজে সাধারণতঃ জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই খুব বেশী থাকে। কারণ এই ধরনের অর্থনীতিতে মৃত্যুহার কমানোর অর্থাৎ রোগ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা থাকে না। আবার মৃত্যুহার বেশী হওয়ার দরুণই পরিবার বৃদ্ধির প্রবণতাও বেশী দেখা যায়। জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই বেশী হওয়ায় জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কম হয় এবং জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকে। এটি বিবর্তনের প্রথম ধাপ।

এর পরবর্তী ধাপে শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার কিছু প্রসার ঘটলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সামাজিক অবস্থাও পরিবর্তিত হয়। চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসার ও স্বাস্থ্যবিধি

পালনের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু জন্মহার সাথে সাথে হ্রাস পায় না। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকতার ভাষায় একে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটলে বা তার সূচনা হলে দারিদ্র্য, অসম বণ্টন, বেকারত্ব প্রভৃতি প্রকট হয় ও সামাজিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই ধরনের অবস্থা কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। সেইজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর প্রচেষ্টা সহজেই শুরু হয়।

বিবর্তনের তৃতীয় ধাপে আমরা দেখি জনসাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়াসী। আর তার জন্য পরিবার সীমিত করার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও জনসাধারণকে সাহায্য করার অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। কারণ উৎপাদন ও সম্পদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে অর্থনৈতিক প্রগতি আসবে না। বরং সামাজিক আর্থিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

জন্মহার হ্রাস করার প্রচেষ্টা তৃতীয় স্তরে কিছুটা ফলপ্রসূ হয়। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। কারণ ইতিমধ্যে জনজীবনের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটেছে। বৈষয়িক উন্নতির ফলে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন স্বাদ পেয়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্যর উন্নতমান সমাজে চালু হওয়ায় শিশুপালন ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বৃহৎ পরিবার মানুষ আর চাইছে না। তবুও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার যত দ্রুতগতিতে কমছে, জন্মহার ততটা কমছে না। এছাড়া পূর্ববর্তী যুগের বাড়তি জনসংখ্যার চাপও রয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পাবে। তবে বৃদ্ধির হার কমে আসবে।

চতুর্থ ও শেষ ধাপে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতাবস্থায় আসার কথা। মৃত্যুহার ও জন্মহার দুটি অনেক নীচু স্তরে এসে স্থির হচ্ছে, ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কমে যাচ্ছে। এই স্তরে জনজীবনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিবাহ এখন আর তেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা নয়। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতেও কোনও বাধা নেই। জনজীবন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পরিবার সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে নারী, পুরুষ কেউই তেমন আগ্রহী নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও সাধারণের গোচরে এসেছে, এবং বিভিন্ন পদ্ধতি লোকে ব্যবহার করছে। মৃত্যুহার আগেই হ্রাস পেয়েছিল। উন্নয়নের এই স্তরে এসেছে জন্মহার তার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করল। ইউরোপীয় কোনও কোন দেশে জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে এমন এক অবস্থা দেখা দিল যে বিবাহ ও পরিবার বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই মতবাদের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিভিন্ন দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই এই মতবাদে সুসংবদ্ধ ক'রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর থেকে

বোঝা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে জনজীবন ও জনমানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের উপর পড়ে। আবার জনসংখ্যা হ্রাস পেলে অর্থনৈতিক প্রগতির পথ সুগম হয়। কারণ অল্পসংখ্যক লোকের জন্য কর্ম সংস্থান ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা করা সহজ। অর্থনৈতিক প্রগতি ও সীমিত জনসংখ্যা জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। অবসরযাপন ও অবসর বিনোদনে লোকে আগ্রহী হয়। অনেক কাজ যন্ত্রের মাধ্যমে করা সম্ভবপর বলে ছোট কাজে লোকের প্রয়োজন হয় না। জনজীবনে একই সাথে গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়। সেই সাথে হয়ত শ্রমবিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাও কিছু বৃদ্ধি পায়।

2.2 কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি ঃ

বিবর্তনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার গতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। 1981 সনে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 450.8 কোটি[1]। বিভিন্ন অঞ্চলের বসতির ঘনত্ব ও বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1975-80র মধ্যে নিম্নরূপ ছিল—

সারণি 2 : 1

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতির ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির[2] হার। 1975-80

স্থানের নাম	বসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গঃ কিঃ মিঃ তে)	জনসংখ্যার শতকরা বাৎসরিক বৃদ্ধির হার
ইউরোপ	98	0.4
সোভিয়েট রাশিয়া	12	0.9
উত্তর আমেরিকা	12	1.0
ল্যাটিন আমেরিকা	18	2.5
পূর্ব এশিয়া	101	1.4
ক) চীন	105	1.4
খ) জাপান	316	0.9
গ) অন্যান্য	36	2.1
দক্ষিণ এশিয়া	91	2.2
অষ্ট্রেলিয়া	3	1.5
আফ্রিকা	16	2.9
পৃথিবী	33	1.7

উপরের তালিকাতে মোটামুটিভাবে সারা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা এখন বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে। এশিয়ার দেশগুলি মোটামুটিভাবে তৃতীয় স্তরে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার জাপান চতুর্থ স্তরে পৌঁছেছে।

কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে একইভাবে বিবর্তন ঘটেনি। আমরা ইউরোপের কিছু দেশ নিয়ে স্থরু করি যাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতঃ এই বিবর্তনবাদ আলোচিত হয়ে থাকে। অতীতের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ধারাবাহিকভাবে রাখা হয়নি। তবুও সাধারণভাবে বলা যায় যে 1750 এর আগে ইউরোপের সব দেশের জনসংখ্যাই বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ জন্মহার ও মৃত্যুহার দুটিই খুব বেশী ছিল। যেমন 1870 সন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে জন্মহার ছিল হাজারে 35। এই স্থিতাবস্থা ভেঙে যাবার প্রধান কারণ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের স্বব্যবস্থার প্রসার। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রধানতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

1650 থেকে 1800 খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাৎসরিক প্রতি হাজারে 2 বা 3 ছিল। পরবর্তী শতকে জনসংখ্যার গতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। সাধারণভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৃদ্ধি কিন্তু সব দেশেই একরকম ছিল না। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে এই বৃদ্ধির হার হাজারে 10 জনের বেশী ছিল। ফ্রান্স ও ইটালীতে 10 এর চেয়ে কম ছিল। হয়ত আগের দুটি দেশে শিল্প গড়ে ওঠায় ও শ্রমের বেশী প্রয়োজন থাকায় জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে বেড়ে ছিল। ফ্রান্স ও ইটালী কৃষিপ্রধান দেশ। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশী হ'লে নানা অস্থবিধার স্বষ্টি হবে। তাই ওই দুই দেশের মানুষ অপেক্ষাকৃত কম হারে পরিবার বৃদ্ধি করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জন্মহার কমতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে 1880 সন থেকেই এর প্রভাব বোঝা যায়। পরবর্তী 50 বছরে জন্মহার 35 থেকে 15তে এসে দাঁড়ায়। জার্মানীতে এই অধোগতি 1900 সনের পরে দেখা যায়। ফ্রান্সে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মহার খুব কমে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আবার নানা উদ্যোগের ফলে জন্মহার 1945 সনে হাজারে 17র কাছাকাছি আসে। অবশ্য 1946 এ যুদ্ধোত্তর কালে অকস্মাৎ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে জন্মহার হাজারে 20র কাছাকাছি আসে। তার পরবর্তী কালে জন্মহার ওঠানামা ক'রে উন্নত দেশগুলিতে হাজারে 15 থেকে 18তেই থেকে গেছে। মৃত্যুহার অনুন্নত অবস্থায় হাজারে 30 ছিল। সেই হার কমিয়ে 10 এর কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়েছে।

ইউরোপের সোভিয়েট রাশিয়াকে পৃথকভাবে দেখান হয়। কারণ এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা সবকিছুই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির থেকে পৃথক। পূর্ব ইউরোপীয় অন্যান্য সোসালিস্ট দেশগুলিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাখা হয়।

বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর তারা কিভাবে পেরিয়েছে সঠিক জানা যায় না। এদের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ। 1960 থেকে '80 সনের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানীর গণতন্ত্রে জন্মহার শতকরা 21 থেকে 25 ভাগ হ্রাস পায়। 1950 সনে এইসব দেশে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হয়। সোভিয়েট রাশিয়াতে মহিলারা এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য পদ্ধতির চেয়ে গর্ভপাতের উপর বেশী নির্ভর ক'রে।

আবার রুমানিয়া গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার ফলে দেশের সার্বিক প্রজনন হার 1965 থেকে 1970 এর মধ্যে শতকরা 1.98 থেকে 2.89 তে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র উৎসাহী ভূমিকা নেয় না।

উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা দুটি উন্নত দেশ। মেক্সিকো উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত নতুন দেশ। 1800-1900 সনে এর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন লোক ইউরোপ থেকে যেয়ে বসতি স্থাপন করছে। দেশের জন্মহারও বেশী কারণ নতুন বসবাসকারীরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। পশ্চিমদিকের নতুন এলাকায় জীবিকাও বাসস্থান সহজেই পাওয়া যাবে এই ছিল ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মহার হাজারে 50 পর্যন্ত উঠেছে। অর্থাৎ বাধাহীনভাবে প্রজনন হয়ে চলেছে। পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মহার অনেকদিন বেশী ছিল। 1900 সনে জন্মহার ছিল হাজারে 31 জন। 1915 তে জন্মহার 25এ নামে। বর্তমানে অবশ্য জন্মহার হাজারে 15 র কাছাকাছি ও মৃত্যুহার হাজারে 9 জন। অর্থাৎ বিবর্তনের চতুর্থ ধাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৌছে গেছে। উত্তর আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশ মেক্সিকোর অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। 1970 এ এদেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার যথাক্রমে হাজারে 44 ও 9। 1978 এ হ্রাস পেয়ে 38 ও 8 হয়েছে। অর্থাৎ এখনও জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হাজারে 30 জন উন্নত দেশের চিকিৎসা প্রণালী ইত্যাদি গ্রহণ ক'রে মৃত্যুহার কমাতে পারলেও জন্মশাসন সম্ভব হয়নি।

এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা। ছোট্ট দেশ জাপানের অবস্থা পশ্চিম ইউরোপের উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনীয়। তবে এদের সাথে সাথে একইভাবে জাপানে পরিবর্তন আসেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যা যেহারে বেড়েছে তাতে ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় অনেক দ্রুতহার বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান অনেক মানুষ হারিয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে 1948 সনে ও জাপানে জন্মহার হাজারে 33.5 ছিল এবং 50 সনে 27-এ নামে। এর পরে অতি দ্রুত জন্মহার কমে আসে। 1949 ও 1952 সনে ভ্রূণ নাশ সংক্রান্ত আইন বিশেষ উদার করার ফলেই

এ ঘটনা ঘটে। 1955 থেকে জন্মহার কমতে আরম্ভ করে 1960 সনে ইউরোপের দেশগুলির কাছে পৌঁছে যায়। ওই সনে জন্মহার হাজারে 17 জন। মৃত্যুহার হাজারে মাত্র 7 জন। সুতরাং জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিতান্ত কম ছিল না। জাপানে বসতির ঘনত্ব খুবই বেশী।

এশিয়া সর্ববৃহৎ দেশ চীনের জনসংখ্যার গতি এবার কিছুটা অনুধাবন করা যাক্। চীন অতি প্রাচীন দেশ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে জনসংখ্যা অতীতে বারবার হ্রাস পেয়েছে। 1650 থেকে 1850 এর মধ্যে মাঞ্চু-শাসনে দেশে কিছুটা স্থায়িত্ব আসে ও 1850 সনে জনসংখ্যা আনুমানিক 40 কোটিতে দাঁড়ায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে চীন আন্তঃকলহ ও বহু বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাটায়। কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর 1959 সনের লোকগণনায় চীনের জনসংখ্যা মোট 58·3 কোটি বলে দেখা যায়। কম্যুনিস্ট শাসনের গোড়ার দিকে জন-সংখ্যার দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়নি। কিন্তু কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম প্রচলিত হবার ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলে প্রায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার সূত্রপাত হয়। রাষ্ট্র তখন দৃঢ়ভাবে পরিবার সীমিত করণের কার্যসূচী হাতে নেয়। অতি দ্রুত এর ফললাভ হয়। 1979 তে চীনের জনসংখ্যা আনুমানিক 96.5 কোটিতে দাঁড়ায়। জন্মহার হাজারে 38-39 থেকে 18 তে নেমে আসে। মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে কিঞ্চিদধিক 6 জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আনুমানিক শতকরা 1·2 ভাগ। 1985 সনে চীন এই বৃদ্ধির হারকে শতকরা 0.5 শতাংশে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট—যাতে এই শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়। অবশ্য চীনের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে জানা যায় না।

এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশেরও এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। আয়তনে ও জনসংখ্যায় চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও পাকিস্তান—আয়তনে ভারতের থেকে অনেক ছোট। কিন্তু এই দুই দেশে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। 1970 সনে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে হাজারে 30 ও 22। বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ায় এদেশে দুটিতে মৃত্যুহার কিছু কমেছে। কিন্তু জন্মহার 1978 সনেও হাজারে 45/46 জন। ফলে 1978 সনে পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1970 এর অনুরূপ। বাংলাদেশে আবার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়ে হাজারে 28 জন দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যায় চীন, ভারতের পরেই ইন্দোনেশিয়ার স্থান। 1978 সনে ইন্দোনেশিয়ার জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রতি হাজারে যথাক্রমে 37 ও 17 ছিল। মৃত্যুহার

বেশী থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ততটা বেশী হতে পারেনি। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যু দুই" হার কমাবার দিকেই এসব দেশ-এ আরও যত্নশীল হওয়া উচিত। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ছোট ছোট দেশ যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। জনসমস্যা সমাধানেও অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। ষাটের দশকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩ হয়। কিন্তু ওই ক্ষুদ্র কৃষি নির্ভরশীল দেশ এই বিশাল পরিমাণ জনসংখ্যার চাপ সহ্য করতে পারবে না বলেই 60 এর দশকে জনসংখা নিয়ন্ত্রণের কার্যসূচী নেওয়া হয়। 1971 নাগাদ এই বৃদ্ধির হারকে শতকরা 2 ভাগে নামিয়ে আনা হয়।

ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান দেশগুলিতে 1950-60 সনে জনসংখ্যার গতি নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা চালান হয়। এই সমীক্ষা শেষে জানান হয় যে বিবর্তনের প্রথম যুগে এসব দেশে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে জন্মহার হ্রাসের সূচনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই সব দেশ এশিয়ার দেশগুলির মতন ঘনবসতিপূর্ণ নয়। আর এগুলি উন্নয়নশীল পর্যায়ভুক্ত হ'লেও এদের আয় স্তর এশিয়া, আফ্রিকার বহু অনুন্নত দেশের থেকে অনেক বেশী। জনসংখ্যার সমস্যা এদের তেমন প্রকট নয়।

তুলনায় আফ্রিকা মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা অনেক বেশী গুরুতর। প্রথমতঃ আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়নি। সামাজিক দিক থেকেও এই দেশগুলি অত্যন্ত অনগ্রসর। মিশর ও নাইজিরিয়ার মতন অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1978 সনে শতকরা 2.4 ও 3.2 দেখা যাচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকায় যেমন জনসংখ্যা সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, আফ্রিকায় সে সুযোগ নেই।

বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা ক'রে আমরা দেখলাম জন সমস্যার দেশকাল ভেদে ভিন্ন রূপ। আজকের জগতে আমরা পশ্চিম ইউরোপের দেশ-গুলি সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকার অংশ-বিশেষ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডকে উন্নত দেশ ব'লে ধরে নিতে পারি। ধনী দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নেই। 60-এর দশকে কয়েকটি দেশের নীট সংজনন হার এই সত্য সূচিত করছে। যেমন ইংলণ্ডে এই হার 1965 সনেই 1.33, ফ্রান্সে 1960-64 তে 1.34, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় 1955-59 এ যথাক্রমে 1.73 ও 1.82। জন্ম-হারকে সংযত রেখে এরা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এড়িয়েছে ও প্রগতির সুফল ভোগ করতে পেরেছে। নতুন দেশ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্মুখীন হতে হয়নি।

অনেকের মতে এশিয়া, আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিও পাশ্চাত্য দেশের মতন

অভিজ্ঞতা লাভ করবে। কিন্তু এসম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম চালু হওয়া সম্ভব নয়। যেমন জাপান ও ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স অথবা চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে এমন ধারণা করার কোনও সংগত কারণ নেই। জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে স্থিতিশীল জনসংখ্যা সমন্বিত উন্নত দেশের নজির রয়েছে। তারা ওই উদাহরণ অনুকরণ করছে। ফলে সাধারণ নিয়মে জন্মহার হাজারে 35 থেকে 20 তে নামতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গড়ে আনুমানিক 40 থেকে 50 বৎসর সময় লেগেছিল।

চীনে আশা করা যাচ্ছে মাত্র 11 বছরেই তা সম্ভবপর হতে চলেছে। মৃত্যুহার সব দেশই আজকের দিনে কমিয়ে আনতে সক্ষম। কারণ রোগ প্রতিষেধন, স্বাস্থ্যবিধি প্রচলনের জন্য উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। জন্মকালে জীবনাশা এখন উন্নত দেশের ক্ষেত্রে গড়পড়তা 70 বৎসর। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে গড়পড়তা 50 বৎসর। জন্মহার কমিয়ে ও স্থান পরিবর্তন করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনাই হয়ত বিংশ শতাব্দীর দুই দশকের কর্মসূচী হবে। 1700 থেকে 1900 সনের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বাৎসরিক শতকরা 5 ভাগ মাত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই হার .8 ভাগে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে ইউ. এন. ও.র প্রতিবেদনে 1975-80 র মধ্যে বৃদ্ধির হার এর দ্বিগুণেরও বেশী (1.7) হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর এই পরিমাণ জনসংখ্যাকে গ্রহণ করতে পারছে বলেই জনসংখ্যার গতি এই পথে চলেছে। অবস্থা যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেজন্যই স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিতে হবে।

2.3 ভারতের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতের জনসংখ্যার একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্ লোকগণনা কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম। একমাত্র 1841-51 এর দশকে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার .9 হয়েছিল। 1811-21 বা 1831-41 এর মধ্যে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে ওই সময়টিকে অস্থির কাল বলে ধরে নেওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন অংশে শাসন ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। তার ফলে প্রচুর জনক্ষয় হ'ত। উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেত এবং এর মধ্যে সামান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ খরা বা বন্যা দেখা দিলে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়ে যেত। এত বিশাল দেশের জলবায়ু বা বৃষ্টিপাত সব জায়গায় আশানুরূপ হয় না। তাই দেশের কোনও না কোনও স্থানে প্রতি বৎসরই খাদ্যাভাব দেখা দিত। কখন কখনও

এই অসুবিধা ব্যাপক আকার ধারণ করত। সাধারণ মানুষ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাত। স্বাস্থ্যবিধি পালনে আগ্রহী ছিল না। চিকিৎসার সুবিধা ছিল না। ফলে, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে বহুলোকের মৃত্যু হত। কখন কখনও এরকম মহামারী দেখা দিলে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে যেত। অধ্যাপক মহলানবীশের প্রদত্ত তথ্যানুসারে 1600 থেকে 1800 সনের মধ্যে জনসংখ্যার গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা .33, 1801 থেকে 1871 এর মধ্যে শতকরা 0.34 ও 1871 থেকে 1921 এর মধ্যে শতকরা .40 এবং 1921 থেকে 1961-র মধ্যে শতকরা 1.85।

1951 সনের সেন্সাস কমিশনের 1921 সনকে বিরাট বিভাজন আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বিরাট তারতম্য।

1961 সনে জনসংখ্যা কি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রক্ষেপ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞদের প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা তার মধ্যে সর্বাধিক ছিল। কিন্তু 1961 র জনসংখ্যা তাঁদের প্রক্ষেপিত 43.1 কোটিকে ছাড়িয়ে যায়। নীচে 1901 সন থেকে ভারতের জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধির হারের তালিকা দেওয়া হ'ল।

সারণি 2.2

ভারতের জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধির হার[3]

(1901-1981 সন)

বর্ষ	জনসংখ্যা	গত দশকের শতকরা বৃদ্ধির হার
1901	238396327	
1911	252093390	+5·75
1921	251321213	−0·31
1931	278177238	+11·00
1941	318660580	+14·22
1951	361088090	+13·31
1961	439234771	+21·51
1971	548159652	+24·80
1981	685184692	+25·00

পূর্ববর্তী তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 20 বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই সামান্য। কিন্তু 1921-31 এর দশক থেকে উত্তরোত্তর প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার বেড়ে যাচ্ছে, তার গতি 1971-81 তেও ব্যাহত হয়নি। অবশ্য 1951-61র দশক থেকে যে দ্রুত হারে বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল তার গতি সামান্য মন্দীভূত হয়েছে।

এই সময়ে এদেশে জন্ম মৃত্যুহারের অবস্থা এইবার পর্যালোচনা করা যাক।

সারণি 2 : 3

ভারতের জনসংখ্যার প্রতি হাজারে জন্মহার, মৃত্যুহার ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার[4]

1901-1981

বর্ষ	জন্মহার	মৃত্যুহার	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার
1901	45·8	44·4	+ 1·4
1911	49·2	42·6	+ 6 6
1921	48·1	47·2	+ 0 9
1931	46·4	36·3	+10·1
1941	45 2	31·2	+14·0
1951	39·9	27 4	+12·5
1961	41 7	22 8	+18·9
1971	41 1	18·9	+22·2
1981	36·0	14·8	+21·2

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। জন্মহার হ্রাস পেলেও তুলনামূলকভাবে এখনও অনেক বেশী। 1901 সনে জন্ম মৃত্যুহার দুইই খুব বেশী ছিল। 1911 সনে জন্মহার তার থেকে বেড়েছে ও মৃত্যুহার কমেছে। জন্মহারের গতি মন্দীভূত হয়েছে 1951 সাল থেকে কিন্তু মৃত্যুহার 1931 সন থেকেই কমতে শুরু করেছে। 1901 থেকে 1981র মধ্যে জন্মহার হাজারে 9·8 হ্রাস পেয়েছে কিন্তু মৃত্যুহার হাজারে প্রায় 30 হ্রাস পেয়েছে। 1921 থেকে 1981র মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাতে ইউরোপের ও জাপানের ক্রমবিবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে ভারত এখন বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে সন্দেহ নেই।

ভারতের জনসংখ্যার আলোচনা করতে গিয়ে কতগুলি কথা স্মরণে রাখতে হবে। প্রথমতঃ ভারতে বিবাহ প্রথা অতি ব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয়। ডিভোর্স প্রথা তেমন ব্যাপক নয়। তবে বিধবা বিবাহের প্রচলন হিন্দু সমাজে তেমন নেই। সুতরাং বেশ কিছু মহিলা প্রজননক্ষম অবস্থাতে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেন। পুত্র সন্তানের উপর এদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী। সুতরাং একটি পুত্রের জন্য একাধিক কন্যাসন্তান হয়ত জন্মায়। প্রজননের ক্ষেত্রে তার প্রভাবও বেশী। চীন দেশের মত শিশু কন্যাসন্তান হত্যা ক'রে পরিবার সীমিত করার কথা এদেশে ভাবতে পারে না। বিবাহিত মায়েরা ভ্রূণ হত্যার দিকে বড় একটা যেতে চান না। দেশের

বিশাল অংশ গ্রাম। জীবনযাত্রার গতি নিস্তরঙ্গ। শহরের গতিময় জীবন যেখানে নানারকম বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে লোকের পরিচয় নেই। সর্বোপরি স্ত্রী শিক্ষা প্রসার লাভ করেনি। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ধারণা তেমন গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় সামাজিক বিবর্তন না ঘটলে জন্মহার উল্লেখযোগ্য-ভাবে হ্রাস পাবে আশা করা যায় না। যদিও সরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনা নীতি বহুদিন গ্রহণ করা হয়েছে—বাধ্যতামূলক কোনও ব্যবস্থা এ সম্পর্কে গ্রহণ করা হয়নি। আবার উৎসাহদান নীতিও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি।

এদিকে মৃত্যুহার হ্রাস পাবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছে। প্রথমতঃ স্বাধীন ভারতে কৃষি উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে। একই জমিতে একাধিকবার ফসল ফলান হচ্ছে। নতুন জমি কৃষির আওতায় আসছে। সেচের ব্যবস্থা ও উন্নত প্রণালীর চাষের জন্য কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু আর ভারতকে বিপন্ন করে না। উন্নত-ধরনের চিকিৎসা প্রণালী এদেশে গ্রহণ করা হয়েছে। কলেরা বসন্তর মতন রোগের প্রকোপ দূর হয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেহে সমাজের পক্ষে সুস্থ পদক্ষেপ। শুধু মৃত্যুহার কমা নয়, মানুষ নীরোগ, কর্মক্ষম অবস্থায় কাটালে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা নীতি ও উন্নয়ন নীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদি জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে তবে অতিরিক্ত বিনিয়োগ বাড়তি জনসংখ্যার ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়ে যাবে। তবে শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই লক্ষ্য হলে চলবে না। জনসংখ্যা সমস্যাকে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে। যেমন আয়স্তরের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক কি? শিক্ষিত পিতা মাতা পরিবার সীমিত করার দিকে কতটা ঝুঁকছেন এবং কি ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। বিভিন্ন ধর্মা-বলম্বীদের মধ্যে জনসংখ্যা সীমিত করার প্রবণতা কতটা কার্যকরী। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন কেমন, কিভাবে তা পরিবর্তিত হচ্ছে? স্থানবিশেষে জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কি? গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসার প্রবণতা কিরকম বাড়ছে? শহরে বসতির ঘনত্ব কেমন? বিভিন্ন দিক থেকে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতিকে বিচার না করলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

যদিও ভারতের মোট জনসংখ্যা বিশাল এবং ক্রমবর্ধনশীল অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় কিন্তু এই বৃদ্ধির হার কম। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উদাহরণ এ বিষয়ে উল্লেখ্য। আবার সুদূর মেক্সিকো বা নাইজিরিয়াতে জনসংখ্যা অনেক দ্রুত হারে বাড়ছে। বর্তমানে জনসংখ্যার আয়তনের দিক থেকে ভারতের স্থান দ্বিতীয়—

চীনের পরেই। ইউ. এন. ওর জনসংখ্যা বিভাগের প্রক্ষেপিত পরিমাপ অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা 2000 সনে 100 কোটিরও বেশী হবে এবং 2020 সনে 129 কোটির কাছাকাছি যাবে। ওই একই সংস্থা 2000 সনে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 649 কোটি হবে মনে করে। এর মধ্যে শতকরা 22·4 ভাগ মানুষ উন্নত দেশে বাস করবে ও 77·6 ভাগ অনুন্নত দেশের মানুষ থাকবে। অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা খুব বেশী হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

2·4 পরিযান ও নগরমুখীতা

এই বিশাল জনসমষ্টি স্বভাবতঃই একই স্থানে স্থিরভাবে বসবাস করবে একথা মনে করা যায় না। দেশের অভ্যন্তরে মানুষ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাচ্ছে। এই স্থান পরিবর্তন বা পরিযান নানাভাবে হতে পারে—রাজ্য থেকে রাজ্যে, একই রাজ্যের ভিতরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে। আবার একজন মানুষ জীবনে একাধিকবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে পারে। দেশের নাগরিক সে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। সুতরাং পরিযান প্রধানতঃ দুই প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও বর্হিদেশীয়। ভারত জনসংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে—এখানে আভ্যন্তরীণ যাতায়াত সদাই ঘটছে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ পরিযান নিয়েই এদেশে বেশী আলোচনা হয়ে থাকে।

আদমসুমারীর তথ্য থেকে পরিযানের আংশিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। দশ বছরের সময়সীমার মধ্যে মানুষের একবারের সময় পরিবর্তনের কথা এর থেকে জানা যায়। পরিযান সম্বন্ধে পুরো তথ্য আনতে হলে অন্তর্বর্তী সময়ে সমীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংজ্ঞা অনুসারে যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার স্থান পরিবর্তন করেছে সেই পরিযানকারী। সুতরাং এক দেশে নির্দিষ্ট সময়ে মোট পরিযানের সংখ্যা ওই সময়ের মোট পরিযানকারীর সঙ্গে সমান বা কিছু বেশী। সময়সীমা খুব কম হলেই এই দুটি সংখ্যা সমান হবার সম্ভাবনা।

পরিযানের তথ্য অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ মানুষ নতুন আয়ের পথ খুঁজে বের করার জন্য নিজের জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র যায়। কোনও জায়গায় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে গ্রামের থেকে বহুলোক সেখানে কাজের সন্ধানে যায়। কোন গ্রামাঞ্চলে সেচের সুব্যবস্থা হলে উন্নত কৃষি জমির সন্ধানে অনুন্নত এলাকার লোকেরা সেখানে যায়। আবার বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে কৃষি কাজের জন্য শ্রমিকগোষ্ঠী স্বল্প কালের জন্য স্থান পরিবর্তন করে। এক স্থানে যদি অন্য নানা

জায়গার লোক এসে ভিড় করে তবে স্বভাবতই সেখানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলার সমস্যা দেখা দেয়। যেমন বড় বড় শহরে কাজের সুযোগ বেশী বলে মানুষ সেখানে ভিড় করে। ফলে গৃহের সংস্থান, ময়লা নিষ্কাশন ও অন্যান্য নানা সাধারণ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া দুষ্কর হয়।

ভারতে আদমসুমারীর তথ্য থেকে পরিযানের আভাষ পাওয়া যায় 'জন্মস্থানের' সঙ্গে 'বাসস্থানের' তুলনা করে। কিন্তু দশ বছরের পরিযানের ধারণা করতে গেলে আমাদের ব্যক্তির একস্থানে বসবাসের সময়সীমা জানা দরকার। 1971 সনের আদমসুমারীতে জন্মস্থান ছাড়াও বিগত বাসস্থান এবং যেখানে গণনাকারী গণনার সময় ব্যক্তিকে দেখছেন সেখানে তিনি কতদিন রয়েছেন এ সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। 1971 এর সংগৃহীত তথ্য দুইভাবে উপস্থাপিত—পরিযানকারীদের শ্রেণীবিভাগ জন্মস্থান ও শেষ বাসস্থান অনুসারে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতে প্রধানতঃ পশ্চিম থেকে পূর্বে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে জনসমাগম হয়। বাংলার বিশেষ করে বৃহৎ নগরী কলকাতায় বিভিন্ন রাজ্য থেকেই রোজগারের জন্য পুরুষ শ্রমিক আসতে থাকে। আসামের চাবাগান অঞ্চলেও বহুলোক কাজের আশায় পশ্চিমাঞ্চল থেকে যায়। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। আসামে চাবাগানে শ্রমিকদের (যখন তাদের কুলি আখ্যা দেওয়া হত) যাত্রা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয়। মধ্যভাগে বরং কিছুটা কমে যায়। স্বাধীনতালাভের পরে দেশ বিভাগের ফলে আসাম, পশ্চিমবাংলা এবং অংশতঃ বিহারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহুলোক চলে আসে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে—উত্তর প্রদেশ থেকে বহু লোক পূর্ব দিকে চলে আসে। মাদ্রাজ থেকেও 1941 সন পর্যন্ত অন্ধ্র, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা অভিমুখে লোক সমাগম বেশী হয়। অবশ্য ব্রিটিশ ভারতে দক্ষিণের প্রদেশের সীমা বর্তমান রাজ্যসীমার মতন ছিল না। 1911 থেকে 61 র মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের পরিযানের ফলে লাভ লোকসানের একটি হিসাব করে শ্রী ভট্টাচার্য ও শ্রী শাস্ত্রী[5] দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মহারাষ্ট্রে কেরালায় প্রায় সবসময় বহির্গমনের চেয়ে অন্তর্গমন বেশী হয়েছে। আবার উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মাদ্রাজ বিহারে এর বিপরীত চিত্র।

যাই হোক 1961, 71 সনের আগে ভারতে পরিযানের তথ্য উপযুক্তভাবে সংগৃহীত হয়নি। তখনকার সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কেবল লোকেরা যে রাজ্যে জন্মেছে সেখান থেকে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করছে কিনা এটুকুই জানা যায়। এইভাবে 1891 থেকে 1971 এর মধ্যে দেখা গেছে যে বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা প্রায় সবসময়

মোট জনসংখ্যার শতকরা 3 থেকে 3·5 এর মধ্যে রয়েছে। বয়স ও স্ত্রী পুরুষ ভেদে আলোচনা করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী, পুরুষ 15-19 ও 35-39 বৎসরের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করে।

1971 সনের আদমসুমারীর পরিযান তথ্য নিয়ে 1979 সনে মুখ্য পঞ্জীয়ন দপ্তর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে[৬]। এই প্রতিবেদনে 22টি রাজ্য ও 9টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 357টি জেলা ও 147টি শহরাঞ্চলের পরিযানগত তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে 1971 সনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অন্তর্গমন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে 53·3 লক্ষ। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও গোয়া, দমন দিউ ছাড়া সব রাজ্য ও অঞ্চলে এই বহির্গমন অপেক্ষা অন্তর্গমন বেশী হয়েছে। তুলনামূলকভাবে অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে পরিযানের পরিমাণ বেশী। এই বিষয়ে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী। এখানে স্থান পরিবর্তনের শতকরা ৪6 ভাগ গ্রামাঞ্চলে ঘটেছে। অপরপক্ষে চণ্ডীগড় ও দিল্লীতে শতকরা 94 ভাগ স্থান পরিবর্তন ঘটেছে নগরাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশী স্থান পরিবর্তন করে। বিবাহের পর শ্বশুরালয় গমনই এর প্রধান কারণ।

রাজ্য থেকে রাজ্যান্তর ছাড়াও একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে মানুষ স্থান পরিবর্তন করতে পারে। আবার একই জেলার মধ্যেও এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতে পারে। জেলার মধ্যে লোকের যাতায়াত বেশী হয়। পড়শুনার জন্য গ্রাম থেকে শহরে যেতে হয়। গ্রামের কৃষি শ্রমিক অন্য গ্রামে কাজের মরশুমে যায়। মেয়েদের বিয়ে হলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় ফলে এই ধরনের স্থান পরিবর্তন খুব বেশী—45টি জেলার শতকরা 80 ভাগ লোক স্থান পরিবর্তন করেছে দেখা গেছে। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় সে তুলনায় যাতায়াত অনেক কম। জনসংখ্যার সর্বোচ্চ শতকরা 30 ভাগ লোক 60টি জেলায় স্থান পরিবর্তন করেছে দেখা গেছে।

আঞ্চলিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিযানের গুরুত্ব বিশাল। গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার ভারসাম্য রইল কিনা সব সময়ে নজরে থাকা দরকার। সামগ্রিকভাবে পরিযানের বিচার করে চারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে 1979-র প্রতিবেদন-এর তথ্য নিম্নরূপ।

১। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমন—যেসব লোকের জন্মস্থান ও গণনা কালের বাসস্থান দুইই গ্রামাঞ্চলে তারাই এই শ্রেণীতে আসছেন। বিহারে এরা সংখ্যায় সর্বোচ্চ 14.8 লক্ষ, তারপর আসছে উত্তরপ্রদেশ 14.7 লক্ষ। ২। গ্রাম থেকে শহরে আগমন—দেশের

সামাজিক, অর্থনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তন হ'লে শহরাঞ্চলে লোকের বসতি বাড়ে। কারণ শহরে কাজের সুযোগ বেশী। উত্তর প্রদেশে এই ধরনের স্থান পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী ঘটেছে। 17.4 লক্ষ লোক গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। তারপরে আসছে মহারাষ্ট্র। প্রায় সব রাজ্যেই পুরুষরাই বেশী এই সমস্ত কারণে স্থান পরিবর্তন করেছে।

৩। শহর থেকে শহরে আগমন—এক্ষেত্রে জন্মস্থান ও বসবাসের স্থান দুটি দুই ভিন্ন শহরে। ৪টি রাজ্য ও 4টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই জাতীয় স্থান পরিবর্তন বেশী ঘটেছে। চণ্ডীগড়ের শতকরা 75 ভাগ মানুষ এইভাবে স্থান পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মহারাষ্ট্র—মোট স্থান পরিবর্তনকারীর সংখ্যা (15.5 লক্ষ)। ভারতের অন্য সব রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী।

৪। শহর থেকে গ্রামে আগমন—শহরে জনসংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পেলে তা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে প্রসারিত হ'লে শহরের চাপ কমে। তুলনামূলকভাবে এজাতীয় পরিযান কম হয়। এক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র প্রধান স্থান অধিকার করেছে—এখানে 2.5 লক্ষ মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে গেছে। মহারাষ্ট্রের পিছনে আসছে উত্তর প্রদেশ ও কর্ণাটক।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে অধিকাংশ মানুষ গ্রামের অধিবাসী। শহরগুলি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। এবং জনসংখ্যার তুলনায় এইসব শহরে নাগরিকদের বসবাসও জীবন ধারণের সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল। পরিযানের আলোচনায় তাই সারা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে শহরের উপর কিরকম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখার গুরুত্ব রয়েছে।

দেশের শিল্পায়নের সাথে সাথে শহরাঞ্চল গড়ে ওঠে। আধুনিক বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনে বেশী মানুষের এক জায়গায় সংঘবদ্ধ গড়ে ওঠে বসবাসস্থানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নগরমুখীতাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম কারণও বলা যেতে পারে। আবার এটি উন্নয়নের ফলশ্রুতিও বটে। কি হারে নগরমুখীতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার দ্বারা অনেক সময় উন্নয়নের পরিমাপ করা হয়। আবার নগরাঞ্চল বৃদ্ধি পেলে সামাজিক সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের কাজ এক একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়াই শহরের বৈশিষ্ট্য। শাসনতান্ত্রিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা ঘিরে শহরের সৃষ্টি। গ্রামের মানুষ শহরে এসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে আবার শহরের স্থায়ী জনসংখ্যাও নির্দিষ্ট হারে বেড়ে চলে। ফলে শহরবাসীদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা অত্যন্ত অসুবিধা-জনক হয়ে পড়ে। শহরের জীবনযাত্রা প্রণালী অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের। তবে এখানে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশী। এই সব মানুষের জন্য গৃহের সংস্থান, পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, খেলাধূলার মাঠ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা

একটা বিরাট দায়িত্ব। আবার শহরে গ্রামের তুলনায় কাজের সুযোগ যেমন বেশী, বেকারত্বও তেমনি প্রকট।

ভারতের আদমসুমারীতে 1961 থেকে 1981র মধ্যে শহরাঞ্চলের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও সঠিকভাবে শহরের সীমানা নির্ধারণ কঠিন কাজ। বড় বড় শহরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সুযোগ সুবিধার তারতম্য। আবার কতকগুলি গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েও কিছু সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়ে সেগুলি শহরের রূপ ধারণ করেছে। সাধারণতঃ শহরাঞ্চলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন বসতির ঘনত্ব বেশী হয়। অধিকাংশ কর্মক্ষম লোক শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি অকৃষি পেশায় লিপ্ত থাকে। পুরুষের সংখ্যা বেশী হয়। স্বাক্ষরতার হার বেশী থাকে। এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই যে সব শহরে থাকবে তা নয়।

ভারতের নগরমুখীতার সম্পর্কে দু'টি বিষয় স্মরণযোগ্য। প্রথমতঃ 1911 সন থেকেই এখানে শহরাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা ধীরগতিতে হ'লেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ মোট শহরের সংখ্যাও বাড়ছে। লোকসংখ্যা অনুসারে শহরগুলিকে 6 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 1 লাখের উপর জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তারপর ক্রমান্বয়ে 5000 পর্যন্ত লোকসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের আরও 4টি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। সর্বশেষ আসছে সেইসব শহর যাদের লোকসংখ্যা 5000 এর কম।*

বিংশ শতাব্দীতে এদেশে ক্রমান্বয়ে শহরবাসীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

তালিকাটি[7] নিম্নরূপ

শহরের শ্রেণী	লোকসংখ্যা
1	1 লাখ ও তার উর্ধ্বে
2	50,000 থেকে 99,999
3	20,000 ,, 49,999
4	10,000 ,, 19,999
5	5,000 ,, 9,999
6	5,000 এর নীচে

সারণি 2·4 থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি দশকে শহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। 1931 পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার তত বেশী ছিল না। 1941-51 তে তুলনামূলকভাবে শহরবাসীর সংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। পরের দশকে গতি সামান্য মন্দীভূত হলেও আবার তা তেজী হয়েছে। ভারতের পঞ্জীয়ন দপ্তরের 1981 সনের প্রক্ষেপিত শহরবাসীর সংখ্যা বলা হয়েছিল 20 কোটি মতন হবে। তার চেয়ে আদমসুমারীর হিসাবে

সারণি 2 : 4

ভারতে শহরবাসীর সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার 1901-1981[8]

বৎসর	মোট শহরবাসী কোটি হিসাবে	মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহরবাসীর অনুপাত (শতকরা হার)	পূর্ব দশকে শহরবাসীর শতকরা বৃদ্ধির হার
1901	2·58	10·84	
1911	2·59	10·29	0·3
1921	2·80	11·17	8·3
1931	3·34	11·99	19·1
1941	4·41	13·85	32·0
1951	6·24	17·29	41·4
1961	7·89	17·97	26·4
1971	10·91	19·90	38·2
1981	16·10	23·31	47·5

কম দেখা যাচ্ছে। 2001 সনে শহরবাসীর সংখ্যা প্রায় 28 কোটি দাঁড়াবে বলা হয়েছে। 1981 সনের আদমসুমারী[9] তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে চণ্ডীগড়ে শহরবাসীর অনুপাত সবচেয়ে বেশী (93·73%) ও অরুণাচলে সবচেয়ে কম (6·56%)।

শহরবাসীদের অধিকাংশই বড় শহরের অধিবাসী। 1971 সনের সংক্ষিপ্ত একটি হিসাব থেকে এই সত্য পরিস্ফুট —

সারণি 2 : 5

ভারতে বিভিন্ন ধরনের শহর ও তার জনসংখ্যা[10]

1971 সন

শহরের শ্রেণী	মোট শহরের সংখ্যা	মোট শহরবাসীর শতকরা অংশ
1	147	56
2	185	11
3	583	16
4	874	11
5	680	5
6	172	1
	2641	100

প্রথম দুই শ্রেণী অর্থাৎ 50 হাজারের উর্ধ্বে লোকের বাস যেসব শহরে সেখানেই

শহরবাসীদের অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে। ছোট শহরে মাত্র শতকরা 1 ভাগ শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের বাস।

ভারতে শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। নগরমুখীতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বরং অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মেট্রোপলিটন শহর সংখ্যায় খুব কমই। কিন্তু এসব জায়গায় গ্রাম থেকে দরিদ্র জনসাধারণ এসে ঘন বসতি গড়ে তুলেছে। নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধার অভাবে এবং তাদের দারিদ্র্যের জন্য সেগুলি অনেক সময় বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

এই জাতীয় জনসংখ্যার চাপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। নগর পরিকল্পনাবিদরা এদের সমস্যা নিয়ে বিব্রত। আবার অন্য দিকে কতকগুলি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি ক'রে উন্নত অঞ্চল যা মোটামুটি শহরের পর্যায় পড়ে যেগুলি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়নি।

একাধারে বড় বড় শহরের জনসংখ্যাকে কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় আবাসস্থল গড়ে তোলার সুযোগ দিয়ে যানবাহনের সুবিধা ক'রে দিতে হবে। অন্যদিকে সুদূর গ্রামাঞ্চলের আওতার মধ্যে মোটামুটি কিছু শহরের কাঠামোতে সুবিধা দিয়ে উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ এসে পড়লে উন্নতির পরিবর্তে নতুন সমস্যাই দেখা দেবে।

2.5 উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার মূল্যায়ন

উন্নয়নের গতির সঙ্গে জনসংখ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধির হার, স্ত্রী পুরুষ অনুপাত, বয়স বিশেষিত গঠনের উপরেই দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান নির্ভর ক'রে। বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয় কি হবে তা জনসংখ্যার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অপর পক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে মরণশীলতা ও জন্মহার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত করে। আমরা অবশ্যই দেখেছি যে উন্নয়নের সাথে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে জনসংখ্যার মধ্যে একটা স্থিতিশীলতা আসে। কিছুদিন এইভাবে কাটলে জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন পরিবর্তিত হয়। মোট জনসংখ্যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মানুষের অনুপাত বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে বিনিয়োগের হারের সাযুজ্য রাখতে হবে। জাতীয় আয় বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল। আবার মাথাপিছু আয় মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করে নির্ধারণ করা হয়। কোন দেশের উন্নয়ন স্তর নির্দেশ করতে গেলে

মোট জাতীয় আয়ের থেকে মাথাপিছু আয়ই বেশী নির্ভরযোগ্য কারণ তা জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য।

দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ইত্যাদিতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ হবে তাও কত লোকের জন্য এই সব সুবিধা গড়ে তুলতে হবে সেই অনুসারে বিবেচনা করা হয়।

পরিকল্পিত উন্নয়নে মাথাপিছু আয়কে একটি নির্দিষ্ট স্তরে আনার লক্ষ্য স্থির হয়। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর জন্য দেশের মূলধন সংগঠন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজন। বিনিয়োগ আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় দুটি পৃথক কার্যপ্রণালী। উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয় ও সঞ্চয় ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি কতটা সঞ্চয় করবেন সেটা তার আয়, পরিবারের আয়তন, ভোগের স্তর, দূরদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। পরিবারের আয়তন যদি বড় হয় তবে ভোগ-ব্যয় বেশী করতে হবে। আবার জন্মহার বেশী থাকলে পরিবারে কমবয়সী নির্ভরশীল লোক বেশী থাকবে। সুতরাং সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম হবে। অপরপক্ষে অধিক জনসংখ্যা জীবনযাত্রার স্তরকে উর্ধ্বমুখী হতে দেয় না। সুতরাং ভোগের স্তর খুবই সাধারণ হওয়ার ফলে ভোগ ব্যয় বেশী হয় না। তবে ভোগ স্তর কম থাকার জন্য মানুষের শ্রম দক্ষতাও কম হয় এবং আয়ও কম হয়। সুতরাং সঞ্চয় বেশী হতে পারে না।

সঞ্চয়ের হারের উপর জনসংখ্যা ও তার আঞ্চলিক বণ্টনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প প্রসার প্রয়োজন। শিল্পের প্রসার ঘটলে দেশে নাগরিক জীবন বৃদ্ধি পায়। শহরের ভোগের স্তর গ্রামের ভোগের স্তরের চেয়ে সবসময় বেশী থাকে। শহরে অনেকরকম ভোগ্য বস্তু, আরামের উপকরণ পাওয়া যায়। আবার শহরের সুবিধাগুলি গড়ে তোলার জন্যও বিনিয়োগের প্রয়োজন। শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নানারিকম কাজের প্রয়োজন হয়। এই সব কাজের ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও আয়ের সৃষ্টি হয়। তাই শহরের মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা কম হলেও অধিকতর আয় সৃষ্টির ফলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা।

উন্নয়নের সাথে সাথে জনসংখ্যা গতিশীল হয়। মানুষ স্বভাবতঃই যেখানে আয় ও ভোগের সম্ভাবনা বেশী সেখানে গিয়ে বসবাস করতে চায়। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন গড়ে ওঠে লোকে নতুন জমির সন্ধানে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যেতে থাকে। ভারতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্বাঞ্চলে আসাম, বাংলাদেশে কাজের আশায় বহু লোক পশ্চিমাঞ্চল থেকে চলে আসে। সরকারী প্রচেষ্টায় নতুন শিল্পনগরী গড়ে উঠলে সেখানের মানুষের প্রয়োজন মিটাতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে

ওঠে। সুতরাং কোনও অঞ্চলের উন্নয়ন হ'লে সেখানে মানুষের বসতি বৃদ্ধি পায় এই লক্ষণটি অশুভ নয়। তবে দেখতে হবে যে সুযোগ সুবিধার তুলনায় যেন অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি না হয়ে যায়। সুতরাং শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। শিল্পে বিনিয়োগ করার সময়-এ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা দানের জন্য কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তাও স্থির করা প্রয়োজন। যে খাতেই বিনিয়োগ হোক না কেন তার ফলে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হবে। তবে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশী হ'লে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ ব্যয়ের স্তর ঊর্ধ্বে থাকবে। তাই উপযুক্ত সঞ্চয় না হতে পারায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ কম হবে। সামাজিক সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে আরও কম হবে।

জনসংখ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক বিচিত্র সম্পর্ক। উভয়ে উভয়কে প্রভাবিত ক'রে। জনসংখ্যার গঠন ও পরিমাণের উপর দেশের মোট সঞ্চয় অনেকাংশে নির্ভরশীল। সঞ্চয়ের সঙ্গে বিনিয়োগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আবার বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভর করছে যা নাকি জনগণকে বাঁচিয়ে রাখবে। ধরা যাক্ কোন অনুন্নত দেশ পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ গ্রহণ করেছে। প্রথমেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, ফলে কিছু অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হবে। এখন এই বাড়তি আয়ের ফলে যদি সমাজে বিবাহ ও পরিবার বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ে তবে ভোগ ব্যয়েই উদ্বৃত্ত আয় নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে নতুন বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী হবে।

আবার আয় বাড়লে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কমতে পারে। কারণ নতুন বিনিয়োগে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। জীবনযাত্রা প্রণালীতে নতুন স্বাচ্ছন্দ্য আনে। এই স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে গেলে পরিবার সীমিত রাখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে যে কারণে ফ্রান্স খুব দ্রুত অগ্রগতি না লাভ করলেও জনসংখ্যাকে সীমিত রেখেছিল।

মোট কথা জনসংখ্যার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক অনুধাবন করতে গেলে আমাদের জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মূলধন সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য-যোগান এবং পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা আলোচনা ক'রে দেখতে হবে। জনসংখ্যার পরিমাণ কিরকম হ'লে ভাল হয় তা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে নজর রেখে নির্দেশ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদকে জনসম্পদ ও মূলধনের সংগঠনের সাহায্যে কাজে লাগাতে হবে। জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে মূলধন সংগঠনের কাজ ব্যাহত হয়। আবার প্রাকৃতিক

সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রথমেই খাদ্যের সংস্থান করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই খাদ্যের জন্য মানুষ কৃষির উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। তাই দেশের ভূমি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কৃষিজ উৎপাদন করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকেও উৎপাদনের আওতায় এনে যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

যদি ভূমি সম্পদ জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট না হয় অথচ অন্যান্য সম্পদ দেশে বেশী থাকে তবে অন্য দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেই বাড়তি উৎপন্নের বদলে খাদ্য আমদানী করা যায়।

সমাজের প্রগতির সাথে সাথে উৎপাদনের কলাকৌশল অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। নানা ধরনের জিনিষের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। ভোগের স্তর বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে অপর একটি অসুবিধা মনুষ্য সমাজে দেখা দিয়েছে তা হ'ল পরিবেশ দূষণ বা প্রকৃতিতে ভারসাম্যের অভাব। কৃত্রিম জিনিসের ব্যবহার ও কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভর মানুষকে সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

মানুষের সমাজ গতিশীল। বর্তমানের উন্নয়ন স্তরকে দূর ভবিষ্যতের স্তরের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়। উন্নয়নের সঙ্গে জনসংখ্যার যে ক্রম বিবর্তনের ধারার নজির পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে দেখা গেছিল সেটিকে যে এখনও সব উন্নয়নশীল দেশে প্রত্যক্ষ করা যাবে এমন নয়। দেশ, কাল ভেদে উন্নয়নের স্তরের সঙ্গে জনসংখ্যার আয়তন, গঠন, বণ্টন ইত্যাদি পরিবর্তিত হবে। তবে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যে ঘনিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য U. N. O.—Demographic Year Book 1981
2. দ্রষ্টব্য 1-এর অনুরূপ।
3. দ্রষ্টব্য Census of India 1981—Final Population Totals Paper 1 of 1982.
4. দ্রষ্টব্য Basic statistics Relating to the Indian Economy Vol I August 1982 (Economic Intelligence Service) Centre for Monitoring Indian Economy, Bombay.
5. দ্রষ্টব্য P. J. Bhattacharyya and G. M. Sastry—Population in India, a study of inter state Variation.

6. দ্রষ্টব্য Census of India 1971, Geographic distribution of internal migration in India, September 1979
7. দ্রষ্টব্য S. N. Agarwal—India's Population Problem.
8. দ্রষ্টব্য 3 ও 7 এর অনুরূপ।
9. দ্রষ্টব্য 3 এর অনুরূপ।
10. দ্রষ্টব্য 7 এর অনুরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়
ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার কয়েকটি পরিমাপকের ব্যাখ্যা

3·1 জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন

জনসংখ্যার গতি নির্ধারণে আয়তন ও গঠন উভয় তথ্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। গঠনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—বয়স ও নারী-পুরুষ অনুপাত। জনগণের বয়স অনুসারে শ্রেণীবিভাগ সরকারের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজন মেটায়। যেমন সৈন্য সংগ্রহ করতে হলে যুবক বয়সের পুরুষের সংখ্যা জানতে হয়। সমাজে শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে—কোনও নীতি গ্রহণ করতে হলে দেশে নির্দিষ্ট বয়সের শিশু সংখ্যার তথ্য জানা দরকার। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বয়স বিশেষিত গঠনের হিসাব একান্ত জরুরী। যেমন 6 থেকে 11 বছরের মধ্যে কত শিশু আছে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কি দেখে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বয়স ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রাথমিক সূত্র। এক এক বয়সে মানুষের চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি এক এক রকম হয়। নির্দিষ্ট একটি বয়ঃসীমার মধ্যে জনসংখ্যার কত অংশ অন্তর্ভুক্ত তা দিয়ে সেই গোষ্ঠীর সামাজিক গুরুত্ব বোঝা যায়। তাই জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনাকারীদের কাছে জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনের ধারণা বিশেষ জরুরী। তাত্ত্বিক দিক থেকে জনসংখ্যার যেকোনও পরিমাপ বা প্রক্ষেপের জন্য বয়স অনুসারে শ্রেণীবিভাগের তথ্য অবশ্য সংকলনীয়। বয়স ও লিঙ্গের শ্রেণীবিভাগের উপর জনগণের প্রজনন ক্ষমতা, বিবাহের প্রবণতা, মরণশীলতা প্রভৃতি নির্ভরশীল।

প্রতি দেশের আদমসুমারীতেই ব্যক্তি সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণ করা হয়ে থাকে। লোকগণনার সময়ে ব্যক্তির বয়স কত এটি প্রশ্নসূচীতে জানতে চাওয়া হয়। নিম্নলিখিত দুটির মধ্যে যে কোনও একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। লোকগণনার তারিখ ও জন্ম তারিখের অন্তর্বর্তী সময় বয়স হিসাবে

সূচিত হতে পারে। আবার লোকগণনার সময় ওই বৎসরে কত বয়স ছিল তা বলা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতির তথ্য বেশী নির্ভরযোগ্য।

জন্মতারিখ অনেক মানুষের স্মরণ থাকে না। কোথাও কোথাও জন্ম বৎসর ও লোকগণনা বৎসরকে দুই সীমা গ্রহণ করে বয়স নির্ধারিত করতে হয়। বয়সের তথ্যের মধ্যে কিন্তু ভুল থেকে যায়। কারণ মানুষকে দেখে তার নির্দিষ্ট বয়স বলা যায় না, যেমন নাকি স্ত্রী-পুরুষ ভেদের ক্ষেত্রে বলা সম্ভব। ভুল ত্রুটি থাকার কারণ খুবই সাধারণ। অনেক মানুষ বিশেষ করে বেশী বয়সে তার সঠিক বয়স মনে করতে পারে না। অনেকে সঠিক বয়স বলতে চান না। তথ্য সংগ্রাহকও ঠিকমত প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হন না। শূন্য দিয়ে শেষ হয় এমন বয়স বলার দিকে লোকের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। তারপরেই আসে 5 দিয়ে শেষ হয় এমন বয়স। যেমন যাঁর বয়স 42 বছর তিনি নিজেকে 40 বছরের বলতে উৎসাহী। যাঁর বয়স 38 বছর তিনি ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বলবেন। আবার একেবারে ছোট শিশুর জন্ম তথ্য অনেক সময় মা বাবার ভুলবশতঃ সংগ্রহ করা হয় না। ফলে বয়স বিশেষিত গঠনে কতকগুলি ত্রুটি দেখা যায়। যেমন খুব ছোট শিশুর সংখ্যা কম হয়। শূন্য বা পাঁচ দিয়ে শেষ হয় এমন বয়সের লোক সংখ্যা তুলনা-মূলকভাবে বেশী হয়। পর পর দুটি বয়স শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। একই বয়স শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ থাকে। পরপর দুটি আদমসুমারীর তথ্য কিংবা একই আদমসুমারীর দুটি বয়সশ্রেণীর তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এই ধরনের অসংগতি ধরা পড়ে। সাবধানতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করলেও এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক সময়েই কিছু কিছু থেকে যায়।

জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন হয়। তবে সাধারণভাবে এটি একটি পিরামিড আকৃতি ধারণ করে। তলার দিকে অল্পবয়সী মানুষদের নিয়ে একটি প্রসারিত ভিত্তি থাকে। ক্রমশঃ যত বয়স বাড়ে জনসংখ্যা কমতে থাকে এবং শেষের দিকে অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়। এর কারণ মরণশীলতা বেশী বয়সে অধিক কার্যকর। 1971 সনের আদমসুমারী তথ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন নিম্নরূপ।[1]

বয়স	জনসংখ্যা (হাজার হিসাবে)
0-19	23098·6
20-29	6744·2
30-39	5577·6
40-49	4009·7
50-59	1466·1
60+	1349·4
বয়স জানা যায় নাই	65·6

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণতঃ ভিত্তিটি বেশী সম্প্রসারিত এবং উপরের দিকে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে হ্রাস পায়। কিন্তু উন্নত দেশের জন্মহার তুলনামূলকভাবে কম। তাই ভিত্তি অপেক্ষাকৃত সংকুচিত। আবার এসব দেশে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল অনেক বেশী। তাই পিরামিডের শীর্ষও কিছুটা বিস্তৃত। উন্নত দেশগুলি এখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা স্থুরু করেছে।

সাধারণভাবে প্রজনন ও মরণশীলতার প্রবণতার উপর বয়স বিশেষিত গঠন নির্ভরশীল। স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম মৃত্যুহার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় তা আমরা আগেই প্রত্যক্ষ করেছি। আকস্মিক কারণে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটলে হয়ত একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীতে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়ে যেতে পারে। আবার যুদ্ধ পরবর্তী সময় হঠাৎ শিশুর সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। এই ধরনের ঘটনা পরবর্তী কালে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনকে প্রভাবিত করে।

ভারতে বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা অনুন্নত দেশের সাধারণ গতি পথেই পরিচালিত হয়েছে। স্থতরাং শতাব্দীর প্রথমে বয়স বিশেষিত গঠনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। 1971 এর আদমস্থমারীর সংগৃহীত তথ্যতে[2] দেখা যায় যে 1901 থেকে 1941 এর মধ্যে 60 বৎসরের ঊর্ধ্বে পুরুষের সংখ্যা শতকরা 5 ভাগের কিছু কম ছিল। ওই বয়সে স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা 5·05 ভাগ মতন ছিল। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী অংশ 15 থেকে 59 বছরের বয়ঃসীমার মধ্যে ছিল।

14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও বালক বালিকার সংখ্যা শতকরা 40 এর নীচে ছিল। এর মধ্যে 1931 সনে সাধারণ গতির থেকে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। 15 বছরের মধ্যে শিশু ও শৈশবাতীর্ণের অংশ বেড়ে শতকরা 40 ভাগ-এ দাঁড়িয়ে আর 60 বছরের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শতকরা 4 এর কাছাকাছি আসে। 1911—21 এর দশকে জনসংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়ে 1921—31 এর দশকে আবার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তাই 1931 এর আদমস্থমারী তথ্যে বয়স বিশেষিত গঠনের সামান্য হেরফের হয়েছে। 1951 সনে আবার জনসংখ্যার মধ্যে 60 ঊর্ধ্বে ব্যক্তিদের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি 3.1 এ পর তিন দশকের আদমস্থমারী অনুসারে জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠন দেওয়া হল।

গত তিন দশকের আদমস্থমারীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বয়স্ক শ্রেণীতে জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কিত তথ্য পৃথকভাবে সংকলিত করলে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে বয়স্ক শ্রেণীতে তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যার অন্তর্ভূক্তি। এসম্পর্কে 1901 ও 1981 র তথ্য সারণি 3.2 এ সংকলিত করা হ'ল।

সারণি 3 : 1

জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠন[3]

1961, 1971, 1981

বর্ষ	বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীতে জনসংখ্যার শতকরা অংশ			
	0-14 বৎসর	15-59 বৎসর	60 ও তার উর্ধ্বে	অজানা
1961	42·02	52·31	5·63	0·04
1971	42·02	52·00	5·96	0·02
1981	39·54	53·93	6·49	0·04

সারণি 3 : 2

বয়স ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ অনুসারে

জনসংখ্যার গঠন[4] 1901 ও 1981

বয়ঃগোষ্ঠী

জনসংখ্যার শতকরা অংশ

বর্ষ	0-14 বৎসর		15-59 বৎসর		60 এর উর্ধ্বে	
	স্ত্রী	পুঃ	স্ত্রী	পুঃ	স্ত্রী	পুঃ
1901	38·0	39 2	56·5	56·2	5·5	4·6
1981	39·5	39·5	53·7	54·0	6·6	6·4

সারণি 3 : 2 এর তথ্য অনুসারে 80 বছর ব্যবধানে মধ্য বয়সে স্ত্রীলোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে গিয়ে বয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

3.2 নারী পুরুষ অনুপাত :—

সব দেশেই মোট জনসংখ্যাকে স্ত্রীলোক ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখান হয়। স্ত্রী পুরুষের শারীরিক, মানসিক গঠন, পারিবারিক ও সামাজিক কার্য-প্রণালী বিভিন্ন হয়। আবার জনসংখ্যার বর্তমান বয়স বিশেষিত গঠন ও স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতের উপর ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার আয়তন নির্ভরশীল। কারণ এই দুটি বৈশিষ্ট্যই বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে। স্ত্রী পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্যের অভাব হলে সমাজে তার প্রতিফলন ঘটে। যদি পুরুষরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম থাকে তবে নারীকে বর্হিজগতে বেশী কাজের দায়িত্ব নিতে হয়। একটি পুরুষ একাধিক বিবাহও করে থাকে। আবার যেখানে স্ত্রীলোকেরা সংখ্যায় খুব কম সেখানে সামাজিক জীবনযাত্রা বাধাবন্ধন হীন। যেমন সীমান্ত অঞ্চলে প্রকৃতি প্রতিকূল পরিবেশে এক ধরনের রাশছেড়া উদ্দাম জীবনযাত্রা প্রণালী দেখা যায়।

মানুষের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ খুব সহজে করা যায়। সুতরাং আদমসুমারীর এই তথ্যটি সবসময় নির্ভরযোগ্য হয়। তবে বয়সের শ্রেণীবিভাগ ক'রে প্রত্যেকটি শ্রেণীতে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কত হবে জানাই সব থেকে প্রয়োজনীয়। বয়সের তথ্য যে সঠিক হয় না আমরা আগেই দেখেছি। তাই বয়স অনুসারে মোট স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণীবিভাগের মধ্যেও ত্রুটি থাকতে পারে।

একটি দেশের জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল— যেমন জন্মকালে স্ত্রী শিশুর সংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষের মরণশীলতার হার, দূরাঞ্চলে বা নিকটাঞ্চলে পরিযানের প্রবণতা প্রভৃতি।

বহুদেশেই পুরুষশিশুর জন্ম তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। কিন্তু স্ত্রীদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বয়স শ্রেণীর মধ্যে মরণশীলতার হার কম থাকায় বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দুই শ্রেণীর মধ্যে ফাঁক কমে আসে। যেসব দেশ-এ বাইরে থেকে লোক আসে না বা দেশের লোক বিদেশে যায় না সেখানে মোট জনসংখ্যার মতন স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত কেবল আভ্যন্তরীণ ঘটনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দূর থেকে জনসমাগম হ'লে সাধারণতঃ পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ কর্মক্ষম যুবা পুরুষই নতুন জীবন ও আয়ের পন্থার খোঁজে দূর ভ্রমণ করে। আবার তেমনি দেশ থেকে দূর দেশে বর্হিগমন হ'লে পুরুষের সংখ্যা কমে যায়। নিকটাঞ্চলের মধ্যে স্ত্রীলোক বেশী স্থান পরিবর্তন ক'রে। ভারতে বিবাহের ফলে এই ধরনের স্থান পরিবর্তন যথেষ্ট ঘটে থাকে।

ভারতের জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতের গতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে 1901 সন থেকে স্ত্রীলোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে পুরুষদের থেকে কম ছিল। নীচের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে এই অনুপাত ক্রমশঃ কমে এসেছে।

সারণি 3 : 3

ভারতের নারী পুরুষের অনুপাত[5]

প্রতি হাজারে—

বর্ষ	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981
প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা	972	984	955	950	945	946	941	930	933

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 1981 তে একমাত্র কেরালাতেই নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী, প্রতি হাজারে 1032 জন। 1901 থেকে 1951 সন পর্যন্ত তামিলনাড়ু ও

উড়িষ্যায় স্ত্রীরা সংখ্যায় বেশী ছিলেন। ছোট ছোট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গোয়া, দমন, দিউ, পণ্ডিচেরী ও লাক্ষাদ্বীপে স্ত্রীদের সংখ্যা 1961 সন পর্যন্ত পুরুষদের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু 1971/1981 তে কেরালাই একমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। কেরালাতে স্ত্রীদের সংখ্যা হাজারে 1004 জন থেকে 1032 এ বৃদ্ধি পেয়েছে 1901 থেকে 1981-র মধ্যে। অতীতে কেরালার মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মনে হয় এর জন্য দায়ী। এখানে শিশু মৃত্যুর হার অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কম। আবার শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্ত্রীশিশু মৃত্যুর হার বেশী।

গ্রাম ও শহরে নারী পুরুষের অনুপাত আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে শহরের পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা অনেক কম। মোটামুটিভাবে ভারতের অধিকাংশ শহরের ক্ষেত্রেই এরকম চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি 3 : 4

গ্রাম ও শহরের স্ত্রী পুরুষের অনুপাত[6]

প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীদের সংখ্যা

বৎসর	সামগ্রিক	শহরবাসী	গ্রামবাসী
1961	941	845	963
1971	930	858	949
1981	933	878	951

আদমসুমারীতেই দেখা যাচ্ছে যে শহরে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 900 জনের কম, যেখানে গ্রামে নারীর সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষ পিছু 950 বা তার কিছু বেশী। 1961 সন থেকে গত বিশ বছরে গ্রামেও নারী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

যেহেতু স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা সহজে নির্ধারণ করা যায় এবং প্রত্যেক দেশেই এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাই এ সম্পর্কে কিছু তুলনাও করা সম্ভবপর। ইউ. এন. ও. প্রকাশিত জনসংখ্যা তথ্য সম্পর্কিত বর্ষপঞ্জীতে বহু দেশের সম্পর্কে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। এই সব তালিকার থেকে মোটামুটি 1960-70 এর অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে যে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই পুরুষের সংখ্যাধিক্য। ল্যাটিন আমেরিকার বেশীর ভাগ দেশে স্ত্রী পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেখানে দুই বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে এবং বহির্গমন বেশী হয়েছে সেখানে স্ত্রীলোকেরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে বেশী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। এখানে 1970 সনে প্রতি 100 জন স্ত্রীলোক পিছু 95 জন পুরুষের হিসাব রয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ওই একই বছর স্ত্রী পুরুষ-এর

অনুপাত ছিল 100 : ৪5। স্ত্রী পুরুষ হারের বৈষম্য বিবাহ ও প্রজননকে প্রভাবিত করে।

3.3 প্রজনন

প্রজননের প্রকৃত অর্থ জন্মদান। নারী সন্তানের জন্মদাত্রী। নির্দিষ্ট বয়স কালে (সাধারণতঃ 15 থেকে 45 বা 15 থেকে 49 বৎসর পর্যন্ত) নারীর প্রজনন ক্ষমতা থাকে। আবার সামাজিক প্রথানুসারে বিবাহিতা নারীর শিশুই সর্বদেশে আইনগত স্বীকৃতি পায়। সুতরাং প্রজননের আলোচনা মোট জনসংখ্যায় নারী পুরুষ অনুপাত, নারীর বয়স বিশেষিত গঠন, বিবাহের প্রবণতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে থাকে।

জন্মহার প্রজননের ধারণা গড়ে তোলার সম্পর্কে প্রথম পদক্ষেপ। একটি নির্দিষ্ট দেশে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাধারণভাবে জন্ম হার পরিমাপ করা হয়। যেমন

$$\text{1981 সনে ভারতের জন্মহার (Crude birth rate)} = \frac{\text{ওই বৎসর যতটি জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করল তাদের সংখ্যা}}{\text{19৪1র মধ্যভাগে ভারতের মোট জনসংখ্যা।}}$$

এই পরিমাপটি সাধারণতঃ প্রতি হাজারে প্রকাশ করা হয়। যেমন 198১ সনে ভারতের জন্মহার প্রতি হাজার জনে 36টি শিশু।

মোট জনসংখ্যার ভিতর শুধু মাত্র প্রজননক্ষম নারীদের সংখ্যা নিয়েও বিভিন্ন অনুপাত হিসাব করা হয়ে থাকে। নারী-শিশু অনুপাত এমন একটি পরিমাপ। আদম-সুমারী বা নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এইভাবে পরিমাপটি গ্রহণ করা হয়।

$$\text{নারী শিশু অনুপাত (Child woman ratio)} = \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে মোট 0-4 বৎসর বয়সের শিশুর সংখ্যা}}{\text{ওই সময়ে ওই স্থানে 15—44/49 বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্যা}} \times 1000$$

হরের স্থানে ওই বয়সের বিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিয়ে পরিমাপটিকে সময় সময় আরও বিশেষিত করা হয়ে থাকে।

জন্মহার থেকে সাধারণ প্রজনন হার অরেকটু বিশেষ ধরনের পরিমাপ

$$\text{সাধারণ প্রজনন হার (General fertility rate)} = \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে মোট যতজন জীবিত শিশু জন্ম নিল}}{\text{ওই সময়ে ওই স্থানে 15-44/15-49 বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা}} \times 1000$$

জন্মহারের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ অনুপাত, বয়স অনুসারে জনসংখ্যার গঠন, বিবাহ প্রভৃতি কোনও তথ্যই গ্রহণ করা হয় না, এটি সাধারণ ধারণা দেয় মাত্র। সাধারণ প্রজনন হারে প্রজননক্ষম নারী সংখ্যাকে পৃথক ক'রে নেওয়ায় পরিমাপের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পায়। বয়স বিশেষিত প্রজনন হার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রজনন অবস্থা সূচিত ক'রে।

বয়স বিশেষিত প্রজনন হার পরিমাপ করতে হ'লে প্রথমেই মোট নারী সংখ্যার বয়স অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। সাধারণতঃ 5 বছরব্যাপী বয়স সীমার এক একটি শ্রেণী গঠন করা হয়—যেমন 15-19, 20-24, 30-34, 40-45, 45-49 প্রতিটি বয়স শ্রেণীভুক্ত স্ত্রীলোক নির্দিষ্ট সময়ে মোট কতটি জীবিত শিশুর জন্ম দিল সে হিসাব নিতে হবে এবং এই দুটি সংখ্যার অনুপাত গ্রহণ করতে হবে

$$\text{যেমন 15-19 বছরের বয়স বিশেষিত প্রজনন হার (Age-specific fertility rate)} = \frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ে ওই বয়সের মায়েরা কতটি জীবিত শিশুর জন্ম দিল}}{\text{ওই সময়ে ওই বয়সের অন্তর্ভুক্ত নারীদের সংখ্যা}} \times 1000$$

বয়স বিশেষিত প্রজনন হার থেকে আবার সামগ্রিক প্রজনন হার (**total fertility rate**) পরিমাণ করা সম্ভবপর। 5 বৎসর অন্তর একটি বয়স শ্রেণী গঠন ক'রে বয়স বিশেষিত প্রজনন হার পরিমাপ করা হয়। 15 থেকে 44/49 বৎসর বয়স্ক স্ত্রীদের প্রত্যেক বয়ঃশ্রেণীর এই হারগুলি যোগ করে 5 দিয়ে গুণ করলেই সামগ্রিক হার পাওয়া যাবে। সাধারণ প্রজনন হারে বয়সের প্রভাব পৃথকভাবে ধরা হয় না। সামগ্রিক প্রজনন হারে তা ধরা হয়ে থাকে।

জনসংখ্যার গতি নির্ধারণে প্রজননের বিভিন্নতার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। জে. বনগার্ট[৪] প্রজনন হারের বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক জন্মদান ক্ষমতার উপর কতকগুলি বাধা সৃষ্টি হয়ে প্রজননের তারতম্য ঘটে।

সারণি 3 : 5

প্রজনন হারের পরিমাপ[7]

বয়স গোষ্ঠী	মোট স্ত্রীলোক	মোট জন্মসংখ্যা	বয়স বিশেষিত প্রজনন হার প্রতি হাজার স্ত্রীলোকে
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	394119	18670	47·37
20-24	335924	75651	225·20
25-29	313611	69048	220·17
30-34	351825	46193	131·30
35-39	372637	23559	63·22
40-44	334594	6409	19·15
45-49	321900	456	1·42
	2424610	239986	707·83

$$\text{সাধারণ প্রজনন হার} = \frac{239986}{2424610} \times 1000 = 99$$

$$\text{বয়স বিশেষিত প্রজনন হার (15-19 বৎসর)} = \frac{18670}{394119} \times 1000 = 47{\cdot}37$$

$$\text{সামগ্রিক প্রজনন হার} = \frac{\text{বয়স বিশেষিত}}{\text{প্রজনন হারের সমষ্টি}} \times 5$$

প্রতি হাজার নারীতে—$707{\cdot}83 \times 5 = 3439$ জন

অথবা নারী প্রতি 3·5 জন

তাঁর মতে স্ত্রীলোকেরা জন্মদান ক্ষমতা ধারণের পুরো সময়টি বিবাহিত থাকত, কোনরকম জন্ম শাসন পদ্ধতির সাহায্য না নিত, গর্ভপাত না ঘটাত এবং শিশুদের বুকের দুধ না খাওয়াত তাহ'লে তারা যে পরিমাণ সন্তানের জন্ম দিতে পারত সেটাই তাদের প্রজনন ক্ষমতার সঠিক ধারণা। এরকম অবস্থায় স্ত্রীলোক সাধারণতঃ 13 থেকে 17টি সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

এই সাধারণ ক্ষমতা বিবাহের বয়স, জন্মশাসন পদ্ধতি গ্রহণের প্রবণতা, স্বেচ্ছায় গর্ভপাত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উন্নত দেশে বেশী বয়সে বিবাহ, জন্মশাসন পদ্ধতির বহুল প্রসার এবং কোনও কোনও দেশে গর্ভপাত আইনসঙ্গত করার ফলে জন্মহার বিশেষ

হ্রাস পেয়েছে। আবার অনুন্নত দেশে বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস স্ত্রীলোকদের মধ্যে বেশী রয়েছে। এটি তাঁদের অজ্ঞাতে জন্ম নিরোধের কাজ করে যাচ্ছে।

ভারতে প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য সাম্প্রতিক কালের আদমসুমারী থেকে গ্রহণ করা হয়। জন্ম পঞ্জীভুক্ত করার প্রথাও রয়েছে। 60 এর দশকের নমুনা পঞ্জীয়ন পদ্ধতি এখন প্রজনন ও মরণশীলতা তথ্য সংগ্রহের প্রধান সূত্র। 1911, 1921, 1931 সনের আদমসুমারীতে আংশিকভাবে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। 1951 সনের আদমসুমারীতে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, কেরালাতে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য বিশদভাবে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে স্থানবিশেষে তথ্য সংগ্রহের নজির আছে। তবে তা সর্ব ভারতীয় তথ্য দেয় না।

ভট্টাচার্য ও শাস্ত্রী[9] 1921, 1931, 1951, 1961, সনে বিবাহিতা স্ত্রী শিশুর অনুপাত যথাক্রমে 718, 837, 753 ও 839 দেখিয়েছেন, তার মধ্যে 1951 ও 1961 সনে গ্রাম ও শহরকে পৃথক করে তথ্য নির্দেশ করে জানিয়েছেন যে গ্রামে জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশী। আবার ধর্মভিত্তিক প্রজনন হার পর্যালোচনা করে বলেছেন যে মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার বেশী। মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে ও জন্মশাসন পদ্ধতির সাহায্য নেবার নজির কম।

ভারত বিশাল দেশ সুতরাং রাজ্যগুলির মধ্যে জন্মহারের তারতম্য রয়েছে। ভারতের মতন বৃহৎ দেশে সর্ব ভারতীয় গড় তেমন কিছু নির্দেশ করে না। আঞ্চলিক তথ্যের উপরই বেশী জোর দেওয়া উচিত। 1981র আদমসুমারীতে দেখা যাচ্ছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের জন্মহার তুলনামূলকভাবে অন্য রাজ্য থেকে বেশী। মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থানের অবস্থাও প্রায় একই রকম। উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতে জন্মহার কম। মৃত্যুহারও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে। তাই জনসংখ্যার গতিকে প্রভাবিত করতে হ'লে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

3.4 সংজনন

জনসংখ্যা তত্ত্বে সংজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। প্রজননের ক্ষেত্রে মোট কত শিশু জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করল সেটি প্রধান। কিন্তু সংজনন কেবলমাত্র স্ত্রী শিশুর হিসাব নেয়। এখানে মাতা-সন্তান নয় মাতা-কন্যা অনুপাতই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংজননের ক্ষেত্রে দুটি পরিমাপ প্রচলিত—মোট সংজনন ও নীট সংজনন হার। (Gross reproduction rate and net reproduction rate)

মোট সংজনন দুটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। আমরা এর আগে সামগ্রিক প্রজনন হার আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে মোট নবজাতকের হিসাব নিয়ে অনুপাতটি

গঠন করা হয়েছে। এখানে কেবল স্ত্রী শিশুরই সংখ্যা নিতে হয়। তাই সামগ্রিক প্রজনন হারকে নবজাতকদের মধ্যে স্ত্রী শিশুর অংশ দিয়ে গুণ করলে মোট সংজনন হার পাওয়া যায়। এই অংশ নিরূপণ করা তেমন কঠিন কাজ নয়।

অপর পদ্ধতিটি আরেকটু বিশদ। সামগ্রিক প্রজনন হারের ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেকটি বয়ঃগোষ্ঠীতে মোট নবজাতক-এর সংখ্যা নিয়ে স্ত্রীদের বয়স বিশেষিত জন্মহার গ্রহণ করা হয়েছে এখানে শুধু স্ত্রী শিশু অর্থাৎ নবজাতিকাদের গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে স্ত্রী-শিশু নিয়ে গঠিত প্রতিটি বয়স বিশেষিত অনুপাতের সমষ্টি মোট সংজনন হারের নির্দেশক। সাধারণতঃ 5 বছরের বয়স শ্রেণী গঠন করা হয় ব'লে এই হারকে 5 দিয়ে গুণ করা হয়। সংজনন হার স্ত্রী জন্মের ধারাবাহিকতার নির্দেশক।

মোট সংজনন হার একটি কাল্পনিক অনুপাত। এই পরিমাপের সাহায্যে একই সময় জন্মগ্রহণকারী 1000 জন স্ত্রীলোকের জন্মদানে সক্ষমাবস্থায় কতটি স্ত্রী-শিশু তারা জন্মগ্রহণ করতে পারবে তারই আন্দাজ করার চেষ্টা করা হয়। দুটি ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই অনুপাত গঠিত হয়। প্রথমতঃ হাজার জন স্ত্রীলোকের সকলে যখন জন্মদানে সক্ষম তখন জীবিত থাকবে। দ্বিতীয়তঃ এরা সকলেই এদের জন্মকালে যে হারে স্ত্রী-শিশু জন্মাত সেই হারে নিজেদের প্রজনন সক্ষমতা কালে স্ত্রী-শিশুর জন্ম দিয়ে যাবে।

নীট সংজনন হার পরিমাপ করতে গেলে মোট হারের সঙ্গে মরণশীলতার হারকে সংযুক্ত করতে হবে। সামগ্রিক প্রজনন হার ও মোট সংজনন হারের মতন এটিও একটি কাল্পনিক পরিমাপ। আগের দুটি পরিমাপ দেখা গেছে যে বর্তমান প্রজনন স্তর বজায় থাকলে প্রজননক্ষম স্ত্রীলোক গোষ্ঠী কতটি শিশু/স্ত্রী-শিশুর জন্মদান-এ সক্ষম। এখন এই সব শিশু জীবন চক্রে বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সংজননের পরিমাপ-এ শুধু স্ত্রী শিশুই-গণনায় আসে। স্ত্রী-শিশুদের প্রজননক্ষম নারীর জীবন পাবার সম্ভাবনা এখানে বিবেচ্য বিষয়। বর্তমান মায়েদের স্থান কি হারে ভবিষ্যতে তাদের কন্যারা গ্রহণ করবে নীট সংজনন হার তারই আভাষ দেবে। অর্থাৎ বর্তমানে মাতৃজাতির স্থান কি হারে ভবিষ্যতে পূরণ করা যাবে এটি এখানে বিবেচ্য বিষয়।

মোট সংজনন হারের মতন নীট সংজনন হারও দুইভাবে পরিমাপ করা যায়। মোট সংজনন হারকে স্ত্রীলোকের জন্ম থেকে প্রজনন ক্ষমতার মধ্য স্তর পর্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাবনার হার দিয়ে গুণ করলে নীট সংজনন হার পাওয়া যায়। ধরা যাক কোন দেশের মোট সংজনন হার 1.72, 49 বছর বয়স পর্যন্তও বর্তমান স্ত্রীলোক গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা .96 অতএব নীট সংজনন হার 1.65। আরও বিশদ ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপ হ'ল প্রত্যেক স্ত্রী বয়ঃগোষ্ঠীর বয়স বিশেষিত জন্মহার গ্রহণ করা। তারপর

প্রতিটি জন্মহারকে ওই বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্য বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাবনা দিয়ে গুণ ক'রে নতুন হার পাওয়া গেল। সব কটি হারের যোগফল নেওয়া হ'ল এবং 5 বছরের বয়ঃগোষ্ঠী তৈরী করা হয়ে থাকলে ওই সংখ্যাকে 5 দিয়ে গুণ ক'রে নীট সংজনন হার পাওয়া যায়। জীবন সারণি থেকে এই জীবিত থাকার সম্ভাবনা হার গ্রহণ করা হয়। নীচের একটি উদাহরণের সাহায্যে মোট ও নীট সংজনন হারের পরিমাপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখান হচ্ছে।

সারনি 3 : 6

সংজনন হারের পরিমাপ[10]

বয়স গোষ্ঠী	মোট স্ত্রীলোক	মোট স্ত্রীশিশুর জন্মসংখ্যা	বয়স বিশেষিত প্রজনন হার স্ত্রীশিশু	স্ত্রীশিশুর জন্ম থেকে এই বয়ঃ গোষ্ঠীর মধ্যস্থল পর্যন্ত বাঁচার সম্ভাবনা	প্রতি স্ত্রীলোক পিছু ওই বয়ঃ গোষ্ঠীর স্ত্রী-শিশুর জীবিত থাকার সম্ভাবনা
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	394119	9015	·0229	·97417	·0223
20-24	335924	36956	·1100	·97131	·1068
25-29	313611	33785	·1077	·96827	·1043
30-34	351825	22383	·0636	·96438	·0613
35-39	372637	11377	·0305	·95866	·0292
40-44	334598	3131	·0094	·95000	·0089
45-49	321900	226	·0007	·93642	·0007
	2424610	116873	·3448		3·335

মোট সংজনন হার $\cdot 3448 \times 5 = 1 \cdot 724$ নীট সংজনন হার $\cdot 3335 \times 5 = 1 \cdot 668$

4 এর কলমে মোট সংজনন হার হিসাব করা হয়েছে।

স্ত্রী-শিশু হারের উপর মরণশীলতা আরোপ ক'রে নীট সংজনন হার পাওয়া গেল। উপরের তালিকায় এই দুটি হার স্ত্রীলোক পিছু যথাক্রমে 1.72 ও 1.66।

নীট সংজনন, মোট সংজনন ও সামগ্রিক প্রজনন হার এই তিনটি কাল্পনিক হার। জন্মহার বা বয়স বিশেষিত জন্মহার যেমন পুরোপুরি বর্তমান তথ্য নির্ভরশীল এগুলি ঠিক তা নয়। তথ্যকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা বিশেষ ধারণা ভিত্তি করে এই পরিমাপগুলি গঠন করা হয়। এই পরিমাপগুলির সাহায্যে আমরা এক বছরের বিভিন্ন বয়স শ্রেণীর

জনগণের অভিজ্ঞতা একটি বয়ঃগোষ্ঠীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতারূপেই উপস্থাপিত করি। নীট সংজনন হার 1 হ'লে মোট সংজনন বা সামগ্রিক প্রজনন যে প্রজনন অবস্থা নির্দেশ করে তাকে জনসংখ্যার একইভাবে পুনঃ উপস্থাপন বলা হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যা পরিবর্তিত হবে না।

প্রজনন অবস্থা এককভাবে জন্মহার নির্ধারণ করে না। জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন, প্রত্যেক বয়স গোষ্ঠীতে প্রজনন অবস্থা জন্মহারকে প্রভাবিত করে। সুতরাং নীট সংজনন হার 1 হলেও জনসংখ্যা বর্ধিত হবে না স্থির থাকবে সেটি উপরিউল্লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে নীট সংজনন 1 হলেও কিছুদিন পর্যন্ত হয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1981 সনের আদমসুমারীতে সাধারণ প্রজনন হার ও সামগ্রিক প্রজনন হার যথাক্রমে 112 ও 3.6 দেখা গেছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য যেন বেশী। সাধারণ প্রজনন হার গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে 119 ও 91 এবং সামগ্রিক প্রজনন হার ওই দুই ক্ষেত্রে 3.9 ও 2.8। জনসংখ্যাকে স্থিতাবস্থায় আনার জন্য জন্মহার হ্রাস করায় ভারত আগ্রহী। সরকারীভাবে 2000 সনের মধ্যে হাজারে জন্মহার 36 থেকে কমিয়ে হাজারে 21 জন করার নীতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ফলে নীট সংজনন হার এক হবে আশা করা যাচ্ছে।

3.5 মরণশীলতা

প্রজনন ও মরণশীলতা জীবনের দুটি বিভিন্ন দিক। প্রজনন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে, মরণশীলতা সেই সংখ্যাকে কমিয়ে দেয়। মরণশীলতার ভূমিকা ঋণাত্মক—তাই মরণশীলতার তথ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু আলোচনার দ্বারা জনসংখ্যার উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা এক্ষেত্রেও নানারূপ পরিমাপক ও সংজ্ঞার দ্বারা এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলেছেন।

মানুষকে জন্মালে মরতে হবে এটি শাশ্বত সত্য। যে মুহূর্তে মানুষ জন্মাল সেইক্ষণ থেকেই সে মৃত্যুর প্রভাবের মধ্যে এসে পড়ল। মৃত্যু যে কোনও সময়ে যে কোনও কারণে ঘটতে পারে। সাধারণতঃ জন্মগ্রহণের কাছাকাছি সময়ে ও বেশ কিছুটা বয়স হ'লে মৃত্যুর প্রভাব বেশী কার্যকরী হয়। বিভিন্ন দেশে মরণশীলতার গতি বিভিন্নরূপ। আন্তর্দেশীয় তুলনামূলক আলোচনার জন্য কয়েকটি পরিমাপ নির্ভরযোগ্য। এই সব পরিমাপের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে একটি জনগোষ্ঠীর মৃত্যুপ্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আবার এই জনগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ আনুমানিক কতবার মৃত্যুর সামনে নিজেকে উপস্থাপিত

ক'রে রাখতে পারে অর্থাৎ মৃত্যুর বিপদ মাথায় নিয়ে জীবন কাটাতে পারে তাও জানা যায়।

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দেশে মৃত্যুর প্রবণতা বিভিন্নরূপে। সামগ্রিকভাবে একটি জনসমাজের মৃত্যুপ্রবণতার পরিমাপ করতে গেলে যে বহুলপ্রচলিত অনুপাত গ্রহণ করা হয় সেটিকে মৃত্যুহার (Crude Death Rate) বলা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পরিমাপ। যেমন 1981 সনে ভারতের মৃত্যুহার জানতে হলে 1981 তে মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যাকে ওই বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। মৃত্যুহার ও জন্মহারের মতন প্রতি হাজার অনুপাতে হিসাব করা হয়। 1981 সনে ভারতে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 14.8 জন। এই পরিমাপের দ্বারা জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর মৃত্যুর প্রভাব নির্দিষ্ট সময়ে কতটা কার্যকরী তা বোঝা যায় না। তাই পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই হার বিশেষ কার্যকরী হয়। তবে দুটি জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির হার এবং বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ বিশেষিত গঠন যদি মোটামুটি একই রকম হয় তবে এই দুই জনসংখ্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার মরণশীলতার সূচক হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। সাধারণতঃ যেসব দেশে 60 বৎসরের ঊর্ধ্বে বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার হার তুলনামূলকভাবে বেশী সেখানে মৃত্যুর হার বেশী হয়। দুটি দেশের মৃত্যুহার কাছাকাছি হ'লেই যে মরণশীলতা একই ধরনের হবে একথা মনে করা যায় না। এক দেশে হয়ত প্রতি বয়ঃগোষ্ঠীতেই মৃত্যুহার বেশী এবং বেশী বয়সে লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, অপর দেশে সকল বয়সে মৃত্যুহার তুলনা-মূলকভাবে কম কিন্তু বেশী বয়সে লোকসংখ্যা বেশী। আবার দুটি দেশের জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন একরকম হলেও বিভিন্ন বয়সে মৃত্যুহারে তারতম্য থাকায় সামগ্রিক-ভাবে মৃত্যুহার বিভিন্ন হতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার বেশী এবং জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনে অল্প বয়সে তুলনামূলকভাবে বেশী লোক রয়েছে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাবার অর্থ বহুদিন পর্যন্ত তার প্রভাব জনসংখ্যার গতির উপর পড়বে। জন্মহার কমে এলে ক্রমশঃ বেশী বয়সে জনসংখ্যার বৃদ্ধি পাবে তখন মৃত্যুহার বাড়বে। জনসংখ্যার গতি নির্ণয়ে জন্ম-হার মৃত্যুহারই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মহার মৃত্যুহার-এর পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক পরিবর্তনের হার বলা হয়। পূর্বোক্ত দুটি অনুপাতে হাজারে নির্ধারিত হলেও পরিবর্তনের হার শতকরা হিসাবে জানান হয়।

মৃত্যুর প্রবণতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন সাধারণ শারীরিক অবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি পালন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্ত্রী পুরুষ ভেদ বয়ন ভেদ, ইত্যাদি। এর মধ্যে শেষের

দুটি বিষয়কে পৃথক করে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকভাবে মৃত্যহার নির্ধারণ করা যায়। এই ধরনের পরিমাপকে আমরা বয়স বিশেষিত বা বয়স-লিঙ্গ বিশেষিত মৃত্যুহার বলে থাকি। বয়স বিশেষিত মৃত্যুহারে বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে মৃতের সংখ্যা হিসাব করা হয় এবং বয়স বিশেষিত জনসংখ্যার গঠন আমাদের জানা থাকে। ধরা যাক্ আমরা ভারতে 1984 সনের 60-69 বছর বয়ঃগোষ্ঠীর মৃত্যুহার জানতে চাই। তবে 1984 সনে ওই বয়ঃগোষ্ঠীতে মোট মৃতের সংখ্যাকে ওই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট 60-69 বছর বয়সের লোকসংখ্যার দ্বারা ভাগ করে বয়স বিশেষিত মৃত্যুহারের পরিমাপ পাওয়া যায়। এই অনুপাত হাজারে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ পরিমাপটি বয়স বিশেষিত জন্মহারের অনুরূপ।

বয়স লিঙ্গ বিশেষিত অনুপাত জানতে গেলে জনসংখ্যা ও মৃতের সংখ্যাকে বয়সের মতন স্ত্রী পুরুষ ভেদেও ভাগ করে দেখাতে হবে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে কি ধরনের বিশেষিত মৃত্যুহার গঠন করা হবে তা নির্ধারিত হয়। বিশেষিত মৃত্যুহারের সাহায্যে জনসংখ্যার এক একটি অংশের একটি সময়-সীমার মধ্যে মরণশীলতা পরিমাপ করা হয়। ধরা যাক, 1980 সনের মধ্যভাগে পশ্চিমবাংলার 40-49 বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা 389286। ওই বৎসর সেই ওই বয়সের 4322 জন স্ত্রীলোক মারা গেল। বয়স লিঙ্গ বিশেষিত মৃত্যুহার হাজারে 11 জন।

আবার নানা কারণে মৃত্যু ঘটে। রোগ, বার্ধক্য, আকস্মিক দুর্ঘটনা এসব কিছুই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কারণ অনুসারে মৃত্যুর শ্রেণীবিভাগ করে কারণ বিশেষিত মৃত্যুহার পরিমাপ করাও সম্ভব। বিশেষ ক'রে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ নির্ধারণে এই পরিমাপ যথেষ্ট সহায়তা করে। এইভাবে রোগের প্রকোপ নির্ধারিত হ'লে রোগ প্রতিষেধক ও চিকিৎসার দিকে নজর দিতে সুবিধা হয়। সমাজে মৃত্যুহার হ্রাস করার এটি অন্যতম পন্থা।

বয়স বিশেষিত মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই হারকে দেশের সামাজিক প্রগতির স্তরের অন্যতম নির্দেশক ব'লে গ্রাহ্য করা হয়। শিশু মৃত্যুর হার নির্ধারণ করতে গেলে দুটি তথ্য জানা আবশ্যক। নির্দিষ্ট সময়ে জীবিতাবস্থায় কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করল এবং তাদের ভিতর কতজন ওই সময়ের মধ্যে মারা গেল। এই পরিমাপ ভবিষ্যৎ শিশু মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সূচিত করছে।

$$\text{শিশু মৃত্যুর হার (Infant mortality rate)} = \frac{\text{জন্মগ্রহণকারী শিশুদের ভিতর নির্দিষ্ট সময়ে কতজন মারা গেল}}{\text{নির্দিষ্ট সময়ে জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা}} \times 1000$$

পশ্চিমবাংলায় 1974 সনের[11] তথ্যানুসারে—

$$\text{এই পরিমাপ} \quad \frac{13755}{269466} = 51{\cdot}0$$

শিশু মৃত্যুর হারকে দুইভাবে দেখা যায়। জন্মের এক মাসের মধ্যেই কতজন মারা গেল এবং একমাস থেকে এক বছরের মধ্যে কতজন মারা গেল। প্রথম ক্ষেত্রে জন্মকালীন পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব বেশী। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জন্মের পর শিশুকে কেমনভাবে রাখা হয়েছে, চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে কিনা এইসব বিষয় জানতে হয়। এইভাবে বিশেষিত মৃত্যু-হার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ বা কোনও নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী গ্রহণের সহায়তা ক'রে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতের মৃত্যুহার বেশী ছিল। তাই জন্মহার বেশী থাকলেও জনসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। 1921 সনের পর থেকে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। ভট্টাচার্য ও শাস্ত্রীর[12] হিসাব অনুসারে 1911-20 র দশক থেকে 1969-70 এর মধ্যে মৃত্যুহার শতকরা 65.9 হ্রাস পেয়েছে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যুহারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 1911-21 সনে এই পার্থক্যের ব্যপ্তী ছিল শতকরা 25.4 ভাগ, 1961-70 এর দশকে তা 10.8 এ এসে নামে। 1920-70 এর অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে বিভিন্ন রাজ্যের মৃত্যুহার বিশ্লেষণ ক'রে এঁরা দেখেন যে রাজস্থান, কেরালা, মহীশূরে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আবার তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয় যেহেতু বোধ হয় তুলনামূলকভাবে এ রাজ্যের মৃত্যুর হার আগে থেকেই কম ছিল। 1981 সনের আদমসুমারীর পর একটি আলোচনা চক্রে[13] বলা হয়েছে যে উড়িষ্যা পাঞ্জাব ও তামিল-নাড়ুতে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশী। আবার অন্ধ্র, গুজরাট ও কর্ণাটকে মৃত্যুহার কম। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে জন্ম, মৃত্যু দুই হারই খুব বেশী। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে মৃত্যুহার হ্রাস করা হয় তবে জনসংখ্যা এ দুই রাজ্যে অকস্মাৎ বেড়ে যেতে পারে।

ভারতে সাধারণভাবে মৃত্যুহার আলোচনা করলে দেখা যায় যে শিশু মৃত্যুর হার এখনও বেশী। 1911-21 এর দশক থেকে 1951-61র দশকে এই হার হাজারে 211 থেকে 139এ নেমে আসে[14]। হাজারে 139 জন শিশু মৃত্যু যথেষ্ট বেশী। আরও ঘটনা যে শতকরা 40 ভাগ মৃত্যুই ঘটে শিশু 5 বছর বয়সোত্তীর্ণ হবার আগে। আধুনিককালে ভারতের মৃত্যুহার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। কৃষি উন্নতির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দূর হয়েছে।

রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেবার ফলে মহামারীর প্রকোপ কমেছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া এখনও প্রয়োজন। তার একটি হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার। 1984 সনে এই হার হাজারে 11 জন। এই হার বেশী থাকার অর্থ জাতীয় সম্পদের অপচয়। এছাড়া এই বিরাট দেশে আঞ্চলিক পার্থক্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা চিকিৎসার সুযোগের অভাব যথেষ্ট প্রকট। যেমন অরুণাচলে 1971 সনেও মৃত্যুহার হাজারে 20 জন ছিল। 2000 সনের মধ্যে মৃত্যুহারকে কমিয়ে প্রতি হাজারে 9 জন করার সরকারী নীতি আমাদের অজানা নয়। 1971 সনেই শহরাঞ্চলে মৃত্যুর হার হাজারে 9·7 ছিল। সেক্ষেত্রে গ্রামে এই হার হাজারে 16 4 জন। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে শহরে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও চিকিৎসার সুবিধা থাকায় মৃত্যুহার কম।

3.6 জীবন সারণি ও প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ঃ—

মরণশীলতা পরিমাপের দুটি পরিমাপের কথা আলোচনা করা হয়েছে। জীবন সারণিতে বয়স বিশেষিত পরিমাপের ব্যবহার করা হয়। জীবন সারণি একটি বিশেষ প্রকৃতির 'ধরন' (মডেল)। এর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার ধারা-বাহিক হিসাব উপস্থাপিত করা হয়। জীবন সারণি গঠনের ভিত্তিটি নিম্নরূপ। ধরা যাক এক নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট সময়ে 1 লক্ষ শিশুর জন্ম হ'ল। যদি সে দেশের বয়স বিশেষিত মৃত্যুহার এই শিশুগোষ্ঠীর উপর কার্যকরী হয় তবে তাদের মধ্যে কতজন 1 বছর না হতেই মারা যেত, কতজন 10 বছর, কতজন 15 বছর পর্যন্ত বাঁচত—আবার এদের সকলের জীবন এইভাবে শেষ হয়ে গেলে গড়পড়তা জীবনকালই বা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াত —এই সব প্রশ্নের উত্তর জীবন সারণিতে সংকলিত হয়। জীবন সারণি একটি কাল্পনিক জনসংখ্যা নিয়ে শুরু হয় যাকে 'র‍্যাডিক্স' (Radix) বলা হয়।

জীবন সারণিতে কয়েকটি তথ্য পর পর উপস্থাপিত হয়। প্রথম সারিতে জন্ম হতে 99 বছরের বয়সের তালিকা নেওয়া হয়। এই তালিকার পাশে জীবন সারণিতে 'র‍্যাডিক্স'এর কত পরিমাণ লোকসংখ্যা জীবিত রইল সেটি সূচিত হয়। তৃতীয় তালিকায় দুটি বয়সের মধ্যে, যেমন ধরা যাক্ 10 থেকে 11 বৎসরের মধ্যে কতটি লোক মারা গেল সেই সংখ্যা থাকবে।

এর পরে আসছে এক ব্যক্তির এক বয়স থেকে পরের বছরের বয়সে পৌঁছানোর সম্ভাবনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তির 40 বৎসর বয়স হয়েছে তার 41 বৎসর বয়সের পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর সম্ভাবনা। অপর পক্ষে 41 বৎসর পর্যন্ত বাঁচার সম্ভাবনার হারও পূর্বোক্ত

হারকে এক থেকে বাদ দিয়ে পাওয়া যায়। এর পরের কলমে দুটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সকলে মিলে কত বছর কাটাল তারই তথ্য সন্নিবেশিত হয়। অর্থাৎ 10 বছর বয়সে যদি 'র‍্যাডিক্সের' 74600 জন লোক জীবিত থাকে ও 11 বছর বয়সের মধ্যে তাদের 261 জন মারা গিয়ে 74339 জন লোক বেঁচে থাকে তবে এই জনগোষ্ঠী অন্তর্বর্তী সময়ে $74600+74339=148939$এর অর্ধেক 74469 বছর কাটিয়েছে। তারপরের সারিতে নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত মোট কতবছর ওই একই জনগোষ্ঠী পৃথিবী উপভোগ করছে তার হিসাব। প্রতি বছরে জনগোষ্ঠীর মোট জীবনকালকে সেই বছরের জীবন সারণির জীবিতের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে গড়পড়তা জীবনকাল বা প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল-এর হিসাব পাওয়া যায়। জীবন সারণির প্রত্যেক বয়সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই তথ্যগুলি থাকে।

নীচে একটি জীবন সারণি আংশিকভাবে উপস্থাপিত করা হ'ল।

3·7 জীবন সারণি : [15]

বয়স	প্রথম বছরের সুরুতে জীবিত ব্যক্তির সংখ্যা	পর পর দুটি বছরের অন্তর্বর্তীকালে মৃতের সংখ্যা	একটি নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তি বিশেষের পরবর্তী বৎসরের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা
1	2	3	$4=3\div2$
0	10000	15322	·15332
1	84678	2522	·03014
2	82126	1950	·02374
3	80176	1473	·01837

পর পর দুই বছরের মধ্যে জীবন সারণির জনগোষ্ঠী মোট কত বছর কাটাল	নির্দিষ্ট একটি বয়সে জীবন সারণির জনগোষ্ঠী মোট সর্বসমেত কত বছর জীবনকাল পেল	নির্দিষ্ট বয়সের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল
5	6	$7=6\div2$
88509	4188830	41·89
82404	4100321	48·42
80404	4017917	48·92
78886	3937513	49·11

এইভাবে 99 বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটি সারিতে তথ্য সংকলন করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কলমের প্রত্যেকটি সংখ্যা থেকে সংলগ্ন তৃতীয় কলমের সংখ্যা বাদ দিয়ে পরবর্তী সংখ্যা

পাওয়া যাচ্ছে। আবার 6 এর কলম থেকে অনুরূপভাবে 5 এর কলমের সংখ্যা বাদ দিয়ে পরবর্তী সংখ্যায় আসা যাচ্ছে। 6 এর কলমের প্রথম সংখ্যা 5 এর কলমের মোট যোগফলের সমান। আবার 7 এর কলমের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট বয়সের মানুষরা মোট কত বছর সকলে মিলিতভাবে জীবন ধারণ করল তা জানা দরকার। মোট জীবনকালকে জীবিত ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই গড়পড়তা জীবনকাল বেরিয়ে আসবে।

জীবন সারণি গঠনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রীতি প্রচলিত। প্রথম ক্ষেত্রে বয়স বিশেষিত মৃত্যুর হারের সঠিক, সম্পূর্ণ তথ্য চাই। কিন্তু সে তথ্য পুরোপুরি সংগ্রহ না করতে পারলে পরোক্ষ রীতিতেও জীবন সারণি গঠন করা হয়ে থাকে। এখানে দুটি আদমসুমারীর তথ্যে পরিবেশিত জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনের তুলনা ক'রে অন্তবর্তী সময়ে বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীতে জীবিতের হার নির্ধারণ করা হয় এবং এই হারকে জীবন সারণি গঠনে প্রয়োগ করা হয়। যেমন ভারতেই জন্ম, মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু থাকলেও বয়স বিশেষিত সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় না। সুতরাং আদমসুমারীরউপর নির্ভর ক'রে পরোক্ষ রীতি প্রয়োগ করা হয়।

জীবন সারণির যে উদাহরণ এখানে সংকলিত হয়েছে তাতে প্রতি বছরের সারিবদ্ধ তথ্য রয়েছে। অনেক সময় জীবন সারণিকে সংক্ষিপ্ত আকারেও উপস্থিত করা হয়। 5 বছরের বা 10 বছরের বয়স শ্রেণী গঠন করে শ্রেণীবিশেষে তথ্য সংকলিত হয়। এই ধরনের সংক্ষিপ্ত জীবন সারণিটি বিভিন্নরূপে টি. গ্রেভিল, জি. কিং, এল. জে. রীড ও এম. মেরিল সংকলিত করেছেন।

উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য অনেক সময় তেমন নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় জীবন সারণি প্রস্তুত করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। সেজন্য সাধারণভাবে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে মডেল জীবন সারণি তৈরী করে প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের জীবন সারণি প্রস্তুত করতে স্থিতিশীল বা অর্ধস্থিতিশীল জনসংখ্যার ধারণা ও আদমসুমারীতে প্রাপ্ত বয়স বিশেষিত জনসংখ্যার গঠন এই দুই তথ্যের প্রয়োজন হয়। মডেল জীবন সারণির সাহায্যে এশিয়া, অফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে বিভিন্ন বয়সের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ইউ.এন. ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, কোল ও ডেমেনির প্রবর্তিত এই ধরনের জীবন সারণি এখন বহুল প্রচলিত।

কোল ও ডেমেনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চার শ্রেণীর সারণি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সারণি ভিত্তি করে প্রজনন বা মরণশীলতার যেসব পরিমাপ গ্রহণ করা হয় সেগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকে।

মডেল জীবন সারণি স্থিতিশীল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত সেখানে পরিযান ঘটে না, প্রজনন ও মরণশীলতার স্তর পরিবর্তিত হয় না ও স্ত্রী-পুরুষ, শিশুর অনুপাত স্থির থাকে। একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল জনসংখ্যা গড়ে তোলা হয়। আর স্থিতিশীল জনসংখ্যার সাহায্যে যেসব পরিমাপ গঠন করা হয় তাদের বিভিন্ন জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রয়োগ করা হয়।

মডেল জীবন সারণি প্রস্তুত করার সময় ধারণা করা হয় যে পাশ্চাত্য দেশের তথ্য অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করে বয়স বিশেষিত মরণশীলতার যে আভাষ পাওয়া যায় তাকেই অন্য দেশেও ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অনুন্নত দেশে মরণশীলতার হার বেশী হলেও যেহেতু উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয় সেহেতু ওই অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু এইভাবে পাশ্চাত্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত জীবন সারণির পরিমাপ অনুন্নত দেশে প্রয়োগ করলে অনেক সময় নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায় না। ডেমেনি তুর্কিস্তানের ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষিণ মডেল প্রয়োগ করে যে শিশুর মৃত্যুর হার দেখিয়েছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তুলনায় তা অনেক কম মনে হয়। আবার এই পদ্ধতিতে জন্মকালে জীবনাশা 58 বৎসর নির্ধারিত হয়েছে। অন্য এক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে জীবনাশা 47 বৎসর দেখা যাচ্ছে। অবশ্য মডেল জীবন সারণির তথ্য নির্ভর করেই বিভিন্ন দেশের তাত্ত্বিক আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। এরকম একটি ভিত্তিভূমি না থাকলে জনসংখ্যার বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা দুষ্কর হ'ত।

সাধারণভাবে জীবন সারণির তথ্য অবশ্য বহু কাজে লাগে। মরণশীলতার ব্যাপক অনুসন্ধানে এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। জীবন সারণির তথ্য জনসংখ্যা প্রক্ষেপণের কাজে ব্যবহার হতে পারে। শুধু মরণশীলতা নয় জীবন সারণি জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যের নানা দিকে আলোকপাত করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের সুবিধা করে দিয়েছে। জীবনবীমা সংগঠনের ব্যাপারে জীবন সারণির ব্যবহার সর্ব দেশেই প্রচলিত। বিভিন্ন বয়সে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের উপর নির্ভর ক'রে বীমার মূল্য ধার্য করা হয়।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর মৃত্যুর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এজন্য প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য পৃথক পৃথক জীবন সারণি গঠন করা যেতে পারে। যেমন শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনরকমের জীবন সারণি প্রস্তুত করা যায়।

জীবন সারণির মধ্যে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ। জন্মাবধি প্রত্যেক বয়সে এই পরিমাপ করা হয়। জীবন সারণির আলোচনায় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কিভাবে নির্ধারিত করা হয় তা দেখান হয়েছে।

সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে একটি কাল্পনিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্দিষ্ট বয়স বিশেষিত মরণশীলতার হার প্রয়োগ করলে যে গড়পড়তা জীবনকাল পাওয়া যায় তাই ওই গোষ্ঠীর মানুষের প্রত্যাশিত জীবন। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবার অর্থ বয়স বিশেষিত বিভিন্ন মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়া। সুতরাং এর থেকে দেশের প্রগতি সূচিত হয়।

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল-এর দুই দিক রয়েছে। জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের সাহায্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিতর মরণশীলতার প্রকোপের তুলনা করা যায়। আবার একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের তালিকা প্রত্যেক বয়সের অন্তর্ভুক্ত মানুষের কাছে ভবিষ্যতে সে আর কতবছর বাঁচার আশা করতে পারে—তার একটা ধারণা দেয়। সাধারণত জন্ম থেকে 4 বছর পর্যন্ত প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বেশী হতে থাকে তারপর প্রতি বছর ওই কাল হ্রাস পায়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও আয়ুষ্কাল বিভিন্ন। এই জন্য স্ত্রী-পুরুষের পৃথক জীবন সারণি গঠন করা হয়।

ভারতে এ্যাকচুরিয়াল প্রতিবেদনে 1881-1951 সনের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে 1951-60 এর তথ্য 1961 সনের আদমসুমারী প্রতিবেদনেও পাওয়া যায়। এই দুই তথ্যকে সংকলিত ক'রে ভট্টাচার্য ও শাস্ত্রী স্ত্রী পুরুষের 5 বছর অন্তর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের দীর্ঘ তালিকা বানিয়েছেন। এই তালিকাটি পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হ'ল।

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে 40 বৎসর সময়ে জন্মকালীন জীবনাশা পুরুষের ক্ষেত্রে শতকরা 85 ভাগ ও স্ত্রীদের ক্ষেত্রে শতকরা 74 ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর থেকে জীবনাশা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে—স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 35 বৎসর পর্যন্ত ও পুরুষদের ক্ষেত্র 55 বছর পর্যন্ত। আবার বেশী বয়সে জীবনাশা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের অবস্থা তুলনা করলে দেখা যায় 1901-11 সনের মধ্যে 60 বছর বয়স পর্যন্ত স্ত্রীলোকদের জীবনাশা তুলনামূলকভাবে বেশী। জীববিদ্যা অনুসারে এটি স্বাভাবিক গঠন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

1951-61 সনের ক্ষেত্রে 35 বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বয়সে স্ত্রীদের জীবনাশা পুরুষদের থেকে কম। 1901-11 ও 1951-61 সামগ্রিক তথ্য আলোচনা করলে মনে হয় বর্তমান কালে ক্রমশ মধ্যবয়সী জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়ে বেশী বয়সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আর বেশী প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে হয়ত মৃত্যুহারের উপর এই প্রবণতার ফল লক্ষ্য করা যাবে।

জনসমষ্টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আঞ্চলিক বিভেদ ভারতে বিশেষ প্রকট। প্রত্যাশিত

সারণি 3 :8

ভারতে 1901-11 ও 1951-61 সনের মধ্যে বিভিন্ন বয়সে স্ত্রী-পুরুষের জীবনাশা ও তার শতকরা পরিবর্তনের হার[16]

বয়স	পুরুষ জীবনাশা 1901-11	পুরুষ জীবনাশা 1951-61	শতকরা পরিবর্তনের হার	নারী জীবনাশা 1901-11	নারী জীবনাশা 1951-61	শতকরা পরিবর্তনের হার
1	2	3	4	5	6	7
0	22·6	41·9	85·4	23·1	40·6	74·3
5	35·0	48·7	39·1	35·4	47·0	32·8
10	33·4	45·2	35·3	33·7	43·8	30·0
15	30·3	41·0	35·3	30·8	39·6	28·6
20	27·5	37·0	34·6	28·0	35·6	27·1
25	24·9	23·0	32·5	25·4	31·6	24·4
30	22·5	29·0	28·9	23·0	27·9	21·3
35	20·2	25·3	25·3	25·3	24·9	20·9
40	18·0	22·1	22·8	18·5	22·4	21·1
45	16·0	19·2	20·0	16·4	19·9	21·3
50	14·0	16·5	17·9	14·3	17·5	22·4
55	12·0	14·0	16·7	12·2	15·1	23·8
60	10·0	11·8	18·0	10·1	13·0	28·7
65	8·1	9·8	21·0	8·1	11·1	37·0
70	6·2	8·1	30·7	6·2	9·3	50·0
75	4·5	6·5	44·4	4·5	7·6	68·9
80	3·1	5·1	64·5	3·1	6·0	93·6
85	1·9	3·7	94·7	1·9	4·3	126·3
90	1·2	2·3	91·7	1·1	2·5	127·3
95	—	1·2	—	—	1·2	—

আয়ুষ্কালের হিসাব ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রূপে। 1951-61 সনের তথ্য অনুসারে সবচেয়ে ভাল ও সর্বচেয়ে মন্দ অবস্থার রাজ্যের তুলনা করলে পুরুষদের ক্ষেত্রে 11 বৎসর ও স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 12·4 বৎসর পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণভাবে পূর্ব উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্মসময়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অপেক্ষা ভাল। অবশ্য প্রত্যেক অঞ্চলেই রাজ্যভিত্তিক অবস্থার মধ্যেও নানারকম পার্থক্য দেখা যায়।

এই জাতীয় বিভেদ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিশেষ প্রকট। নীচের তালিকায় 70 এর দশকের অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

সারণি 3 : 9

ভারতে জন্মকালীন জীবনাশা[17]

1970-75 ও 1976-80

জন্মকালীন জীবনাশা
(বৎসর)

সময়কাল	দেশের শ্রেণী	পুরুষ	স্ত্রী	সাধারণ
1970-75	গ্রাম	48 9	47·1	48·0
	শহর	58·8	59·2	58·9
	সমগ্র দেশ	50·5	49·0	49·7
1976-80	গ্রাম	51·0	50··3	50·6
	শহর	51·6	50·8	60·1
	সমগ্র দেশ	52·5	52·1	52·3

সামগ্রিকভাবে গ্রামের সঙ্গে শহরের জীবনাশার 10 বৎসরের পার্থক্য। আবার গ্রামে পুরুষদের জীবনাশা স্ত্রীলোকদের থেকে বেশী, শহরে তার বিপরীত চিত্র। যেহেতু গ্রামবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী ভারতে স্ত্রীলোকদের জন্মকালীন জীবনাশা পুরুষদের তুলনায় কম। বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতের অভিজ্ঞতা এদের থেকে বিভিন্ন।

সারণি 3 : 10

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীপুরুষের জন্মকালীন জীবনাশা[18]

বিভিন্ন দেশের জীবনাশা (বৎসর)

	ইউ. এস. এ	ফ্রান্স	ইউ. কে	জাপান	ভারত
	1979	1978-80	1968-70	1980	1976-80
স্ত্রী	77·8	78·20	73·8	78·83	52·1
পুরুষ	69·9	70·05	67·8	73·32	52·5

বিভিন্ন দেশের তুলনায় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ভারতে কম। স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য সামান্য হলেও স্ত্রীদের আয়ুষ্কালই তুলনামূলকভাবে কম। এই তথ্য থেকে মনে হয় যে ভারতকে এখনও উন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত করা সম্ভব নয়।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য Statistical Abstract 1976 and 1977 Combined : Bureau of Applied Economics and Statistics, Govt. of West Bengal.
2. দ্রষ্টব্য Census of India 1971—Census Centenary Menograph No 8.
3. দ্রষ্টব্য Census of India 1981—Reports and Tables based on 5 P. C. Sample data.
4. দ্রষ্টব্য 2 ও 3 এর অনুরূপ
5. দ্রষ্টব্য 3 এর অনুরূপ
6. দ্রষ্টব্য Primary Census Abstract 1971.
   1981 এর তথ্য থেকে পরিমাপ করা হয়েছে।
7. দ্রষ্টব্য A. H. Pollard, F. Yusuf and G. N. Pollard.
   —Demographic Techniques.
8. দ্রষ্টব্য J. Bongarts—A. framework formalising the proximate determinants of fertility—Population and Development Review Vol 4 No 1 1978.
9. দ্রষ্টব্য Shri P. J. Bhattacharyya and Shri G. N. Sastri—Population in India, a study of interstate variation.
10. দ্রষ্টব্য 7 এর অনুরূপ
11. দ্রষ্টব্য 1 এর অনুরূপ
12. দ্রষ্টব্য 9 এর অনুরূপ
13. দ্রষ্টব্য Implications of Census 1981—Economic Intelligence Service ; Centre for Monitoring Indian Economy ; Bombay
14. দ্রষ্টব্য H. V. Parry(ed) —Population and its problems.
15. দ্রষ্টব্য Life Tables 1951-60 Census of India—Registrar General of India.
16. দ্রষ্টব্য 9 এর অনুরূপ
17. দ্রষ্টব্য S. R. S. Bullatine Vol XVIII No 1 June 1984
18. দ্রষ্টব্য U. N. O. Demographic Year Book 1981.

চতুর্থ অধ্যায়
জনসংখ্যার গুণগত বিচার

4.1 জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান

জনসংখ্যার আয়তন, গঠন, বৃদ্ধির হার প্রভৃতি নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করা হল। কিন্তু মানুষ প্রাণী সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে মনে করে। সুতরাং জন্ম, মৃত্যু, প্রজননই মানুষের জীবন গতির সম্পর্কে একমাত্র জানবার তথ্য একথা ঠিক নয়। মানুষের উপযুক্ত-ভাবে বেঁচে থাকতে হলে তার পারিপার্শ্বিককে উন্নত করতে হবে। তার নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে পরিস্ফুটিত করতে হবে। জনসংখ্যার গুণগত বিচারে, 'গুণ' একটি অপ্রচুর উপাদান। প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন তার উদ্যম, বুদ্ধি বিবেচনা ইত্যাদি, তার শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যের একটি নিজস্ব ভিত্তিভূমি থাকে। কিন্তু মানুষের শরীর ও চরিত্র উপযুক্তভাবে গঠন করতে গেলে তার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদও যেমন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর—মানুষের উপযুক্ত গুণও তাই। সত্যি কথা বলতে কি গুণগত বিচারে জনসংখ্যার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকেই অপ্রচুর ও ক্রমবিকাশশীল মনে হয়। এই সত্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও যেমন প্রযোজ্য সামাজিক দিক থেকেও তেমনি গ্রহণযোগ্য।

জনসংখ্যার গুণগত বিকাশের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন। উপযুক্ত গুণসম্পন্ন মনুষ্য সমাজ সৃষ্টি করতে গেলে পূর্ব সর্ত হিসাবে জীবনযাত্রার একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুণগত ধারণা নতুন নয়। রিকার্ডো—জমির গুণগত শ্রেণী বিভাগের উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী। জন্মগত ক্ষমতা জীব নির্ভর। যদিও এই ক্ষমতার যথেষ্ট প্রকার ভেদ থাকে। আবার এই ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

গুণ অর্জন সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। এ প্রচেষ্টা শৈশব থেকেই সুরু করতে হয়। শিশু গৃহে মা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের যত্ন কিছুটা উৎকর্ষতা লাভ করে। কিন্তু

পরবর্তীকালে তাকে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। তেমনি শরীরের যত্ন নিয়ে স্বাস্থ্যও গড়ে তুলতে হয়। মানুষের কম ক্ষমতার উপযুক্ত বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন।

আমরা প্রায়ই, জন মূলধন, (**human capital**), এরকম একটি কথা শুনে থাকি। অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য সম্পদকে কাজে লাগায় মানুষ। তাই মানুষের উদ্যম ছাড়া কোনও কাজ সম্ভব নয়। উৎপাদনের জন্য প্রথম প্রয়োজন শারীরিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতা স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। সুগঠিত স্বাস্থ্যের জন্য জন্মের আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হয়। শিশু যেন সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করে। শিশু মৃত্যুর হারও যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। মানুষের জন্ম কিছুটা সম্পদের ব্যবহার করেই ঘটে। তাই শিশু মৃত্যুর হার বেশী থাকা মানে মাতার দৈহিক এবং মানসিক বেদনার সঙ্গে সম্পদ ও প্রচেষ্টার অপচয়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রসূতি ও নবজাতক শিশুর যত্নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। গর্ভবতী মায়ের খাদ্য, বাসস্থান ভাল হলে তবেই মায়েরা স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্ম দিতে পারে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসপাতাল বা প্রসূতি কেন্দ্রে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে। এ ব্যবস্থার একটি সুফল হল যে জন্মকালের ঝুঁকি এতে অনেক কমে যায়। এই ধরনের প্রসূতিসদনগুলি যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, উপযুক্ত ব্যবস্থাদি থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।

জন্মের পর ক্রমশ মানুষ শৈশব থেকে কৈশোরে ও কৈশোর থেকে যৌবনে, তারপর পরম্পর্যাক্রমে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে উপনীত হয়। একটি বাড়ি যদি মজবুত করে তৈরী করা যায় তবে মানুষ বহুদিন পর্যন্ত সেখানে আরামে বসবাস করতে পারে। তেমনি মানুষ যদি সুস্বাস্থ্যর অধিকারী হয়ে দীর্ঘায়ু হয় তবে বহুদিন পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকতে পারে এবং উৎপাদনের কার্যে অংশ নিয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে। এইভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য চাই সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম পালন ও রোগের প্রতিষেধক ও রোগের চিকিৎসা।

ভাল জিনিষ বেশী খেলেই স্বাস্থ্য ভাল হবে এ জাতীয় ভুল ধারণা অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের মনে ছিল। সুষম খাদ্য বলতে আমরা কিন্তু সুরুচিপূর্ণ দামী খাদ্য মনে করি না। মানুষের শারীরিক গড়ন, দেশের আবহাওয়া, কায়িক শ্রম, বয়স প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সামগ্রীর সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের যোগান মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, খাদ্যরুচি প্রভৃতি বিষয়ে নজর দিতে হবে।

সুখাদ্যের সাথে সাথে স্বাস্থ্যবিধির নিয়মকানুন পালন করলে মানুষ অনেক রোগ,

অকাল বার্ধক্য প্রভৃতির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। যেমন নিজের চারপাশের জায়গাগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিভিন্ন রোগের আকর। অজ্ঞতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির কারণে এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অপরিচ্ছন্নতার থেকে অনেক সময় সংক্রামক রোগ দ্রুত প্রসার লাভ করে।

এই সমস্ত সংক্রামক রোগ সহজে প্রতিরোধ করা যায়। সুতরাং স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ মানে শুধুই হাসপাতাল স্থাপন ও নতুন ওষুধের ব্যবহার নয়। জনসাধারণ যাতে স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখে সে বিষয়ে তাদের শিক্ষাদানও অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্যই স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে বেশী বিনিয়োগ হয়। এই সব বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি। উন্নয়নের স্তর নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যের সাথে সাথে শিক্ষার উন্নতিও একান্ত প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্য মানুষের শারীরিক ক্ষমতা বাড়ায়, সুশিক্ষা তেমনি মানুষের মানসিক ক্ষমতা বাড়ায়। শিক্ষার দুটি দিক আছে। প্রথমত সাধারণ শিক্ষা যা মানুষকে সাধারণভাবে জীবনে চলবার পথে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন হয়। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে ব্যয় করলেই শিক্ষার প্রসার লাভ করবে এমন কথা মনে করা যায় না।

শিক্ষার স্তর বিন্যাস আছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মানুষ কিছু ভাষা জ্ঞান, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি আয়ত্ব করে। শৈশবেই এই শিক্ষা সমাপণ হওয়া উচিত। সেজন্য কোনও দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করার সময় সেখানে 6 থেকে 11 বা ওইরকম বয়ঃগোষ্ঠীর বালক বালিকার সংখ্যা কত তা অবশ্য জানতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য অধিক শিক্ষিত শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয় না।

প্রাথমিক স্তরের পর আসে মাধ্যমিক স্তর। এই স্তরে মোটামুটি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে জানতে হয়।

এই স্তর উত্তীর্ণ হ'লে মানুষ জীবন পথে চলবার কিছুটা পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এই স্তর পার হয় তাহ'লেই সেই সমাজ শিক্ষিত সমাজ রূপে পরিগণিত হ'তে পারে। মাধ্যমিক স্তরের পরে আসে উচ্চ শিক্ষার স্তর। এখানেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন ওঠে।

উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। দরিদ্র দেশে সাধারণ শিক্ষাস্তর পার হবার সুযোগ অধিকাংশ লোক পায় না। তাই অনেকেই এসব দেশে উচ্চশিক্ষার খাতে বেশী ব্যয় করার বিরোধী। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে জ্ঞান বৃদ্ধি, গবেষণা কার্যের

প্রসার সাধারণভাবে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। তবে কিভাবে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয়ের সামঞ্জস্য আনতে হবে তা বিবেচনার যোগ্য।

শিক্ষাখাতে ব্যয়কে আমরা ভোগ ব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় কোন হিসাবে চিহ্নিত করব এটি একটি প্রশ্ন। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র ব্যয় করে, ব্যক্তিবিশেষও ব্যয় করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ত প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ ভোগ ব্যয়ের পর্যায় আসতে পারে। কিন্তু এর ফলে মানুষের ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ছে। সুতরাং যত কমই হোক এই ব্যয়কে বিনিয়োগের পর্যায় ফেলাই বিধেয়। রাষ্ট্রের পক্ষে এটি একটি সমাজকল্যাণ-মূলক কাজে বিনিয়োগ ব্যয়। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে সেটি প্রতিনিয়ত মানুষকে সেবা করে চলে। সুতরাং এদিক থেকেও শিক্ষাখাতে ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসাবে ধরে নিতে হবে।

শিক্ষায় বিনিয়োগের সঙ্গে মনুষ্য সম্পদের উৎপাদন কাজে নিয়োগের কর্মপ্রণালীকে যুক্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা নির্দিষ্ট স্তরে কি পরিমাণ চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, হিসাবরক্ষক, প্রশাসকের প্রয়োজন যে সম্পর্কে ধারণা করে নিয়ে এই জাতীয় কর্মীর যোগানের জন্য সুষ্ঠু-ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশে গবেষণা খাতে বা উন্নততর কলাকৌশল শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করা হয়। এই জাতীয় বিনিয়োগ সুস্থ পরিকল্পনার পরিচায়ক নয়। আবার অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে অনেকে উন্নত দেশে গিয়ে বসবাস সুরু করছে। ফলে এইভাবে 'মগজ চালানে'-র (**Brain Drain**) জন্যে উন্নয়নশীল দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মোটকথা দেশকে উন্নত করতে হলে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষিত মানে শুধু অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করা নয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ধারার জন্য কিভাবে পারিপার্শ্বিককে গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কেও সঠিক ধারণা করা ও সেইমত কাজ করা শিক্ষিত সমাজের কাছে আশা করা হয়।

4.2 জনজীবনের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা—

শিক্ষা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি বিধান করে। কিন্তু প্রত্যেক জন সমাজের একটি সাংস্কৃতিক পটভূমিকা থাকে। জীবন ধারণের জন্য দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ বাদেও মানুষের জীবনের একটা অন্য দিক থাকে। একই সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে স্নেহপ্রীতির বন্ধন মনুষ্য জীবনের অন্যতম আশীর্বাদ। মানুষের জন্ম প্রকৃতির মধ্যে। সেই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিয়ে-চলা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অতি

প্রাচীনকাল থেকে যখন মানুষ যাযাবরভাবে ঘুরে বেড়াত তখনও প্রকৃতির রীতি-নীতি বুঝে নিয়ে তাকে চলতে হত। প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটলে সে ভীত হত, আবার প্রকৃতির কাছেই ছিল তার শান্তির আশ্রয়। জীবনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মানুষের চিন্তা ও প্রচেষ্টা তার সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তুলেছে।

প্রাচ্য দেশে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে শান্তির আশ্রয় খুঁজে নিতে চেয়েছে। প্রকৃতি তার কাছে শুধু ভোগের উপকরণ যোগানোর উৎস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র কি এবং কিভাবে এই অজানা পৃথিবীতে মানুষ তার সংগতি খুঁজে পাবে এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা হয়েছে। ফলে প্রাচ্য দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় একটি স্থিতিশীল ভাব আছে।

পাশ্চাত্য দেশের মানুষ প্রকৃতিকে নিজের বলে এনে তার সম্পদ কাজে লাগিয়ে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে বেশী আগ্রহী। এই অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ঘটিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সাংস্কৃতিক জীবন গতিশীল ও বর্ণাঢ্য। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে জনসংখ্যা তত্ত্বে আলোচনা করা হয় না। কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবন জনসংখ্যাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

প্রত্যেক মনুষ্য সমাজেরই একটা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। সংস্কৃতি মানুষের মনের খোরাক যোগায়। সাধারণভাবে আমরা সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য গীতকে সংস্কৃতির পর্যায় ফেলি। অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য মানুষকে নানা কাজে লিপ্ত হতে হচ্ছে। যার ফলে অর্থ সমাগম হচ্ছে এবং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে। এইসব কাজেই জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করতে মানুষ চায় না। এর থেকে অবসর নিয়ে তার মনের খাদ্য সংগ্রহে মানুষ আগ্রহী হয়। জীবনযাত্রার মূল প্রয়োজন যাতে মিটে যাবে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা তত বৃদ্ধি পাবে তবে সবরকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একটি ভিত্তিভূমি থাকে। সেটি নির্ভর করে সমাজজীবনের প্রাথমিক গঠন ও তার বিবর্তনের উপর।

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে একটি শক্ত সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ রয়েছে। তার ফলে তাদের জীবনযাত্রার গতি অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে পৃথক। এই সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন কোনও প্রলেপ দিয়ে এই গতিকে দ্রুত পরিবর্তিত করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতির উপরেই স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভরশীল।

সুস্থ সংস্কৃতি মানুষের মনের উপযুক্ত খোরাক যোগায়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। যেমন শিক্ষিত সমাজে সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। সাহিত্যের মধ্যে সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। সমাজের গলদ দূর করতেও

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের নানা অবদান রয়েছে। একই কাজ অন্য শিল্পের মাধ্যমেও ঘটছে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিগত জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আর ব্যক্তিত্বই জনসংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তি ইউনিট।

4.3 বিবাহ রীতি ও পরিবার প্রথা—

ব্যক্তি একাকী জীবন কাটায় না। জন্মসূত্রে যে তার বাবা, মা, ভাই, বোনও অন্যান্য আত্মীয় পায়। অর্থাৎ সে একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। আবার সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন সেও একটি নতুন পরিবার সৃষ্টি করে। এই জন্যেই সমাজে বিবাহ রীতি প্রচলিত। বিবাহের সঙ্গে প্রজননের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, কারণ বিবাহ মানুষের জন্মের সামাজিক স্বীকৃতি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। অনেক দেশেই বিবাহ প্রথার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যুক্ত। এর ফলে বিবাহের উপর আস্থা বাড়ে, বিবাহ অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব আসে।

জন্মসূত্রে মানুষ যে আত্মীয় পায় ক্রমশ সময়ের গতিতে তাদের অনেকের মৃত্যু হয়। যৌবনেই মানুষের নতুন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হবার সময়। তাই বিবাহের দ্বারা এই সময় নারী পুরুষ একত্রিত হয়। নতুন আত্মীয়তা-বন্ধন গড়ে ওঠে ও প্রজনন সম্ভবপর হয়। যেহেতু নারী একটি নির্দিষ্ট বয়সের সীমায় প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী সেই সময়ের কতটা অংশ বিবাহিত অবস্থায় কাটাবে তার উপর ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেজন্য যেসব সমাজে অল্পবয়সে বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি রীতি প্রচলিত সেখানে জন্মহার বেশী হবার সম্ভাবনা।

বিবাহ প্রথা দেশের সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ভারতে বিবাহের হার খুব বেশী এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে যায়। আবার ইউরোপের স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ান দেশে বিবাহের হার কম ও বেশী বয়সে বিবাহ হয়। অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে বিবাহের গড় বয়স বৃদ্ধি পায়। প্রথমত বিদ্যার্জনে জীবনের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। তারপর উপযুক্ত উপার্জন ও কিছুটা সঞ্চয় করে লোকে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে।

বিবাহের ফলে নতুন পরিবার সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী সন্তান নিয়ে একটি পরিবার। আত্মীয়তাসূত্রে আরও কিছু মানুষ একসাথে বাস করতে পারে। পরিবার কয়েকটি মানুষের প্রাথমিক বন্ধন। পরিবারেই মানুষ একসাথে বাস করতে শেখে। পরস্পরের সুবিধা, অসুবিধা মানিয়ে নিয়ে চলতে শেখে। পরিবারকে একটা প্রাথমিক ইউনিট

বলেই ধরা যায়। কারণ পরিবারের এক বা একাধিক ব্যক্তি যা আয় করে তা সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হয়।

পরিবারের একটি সাধারণ বাসস্থান থাকে। মোট জনসংখ্যাকে মোট পরিবার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পরিবারের গড়পড়তা আয়তন নির্ধারণ করা হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবারের আয়তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করতে এই হিসাবটিকে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় মনে করা হয়।

পরিবার সমাজের ভিত্তি। পরিবারের আয়তন ও গঠন মানুষের সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। পরিবার বন্ধন যত দৃঢ় হয় মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীতে তত সুস্থিরতা আসে। ভারতে হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত মৃত্যু ছাড়া বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তার ফলে পারিবারিক জীবনে স্থায়িত্ব বেশী ছিল। আবার একই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে আত্মীয়তা সূত্রে বিভিন্ন মানুষ বাস করতে হ'লে গোষ্ঠী জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা মানুষ পরিবারের মধ্যেই লাভ করত। এখন এই দুটি বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

ভারতের এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীনকালে অল্পবিস্তর অন্য দেশেও দেখা গেছে। অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথেই অবশ্য ছোট কেন্দ্রীভূত পরিবার (nucleas family) গড়ে তোলার প্রবণতা বাড়ে। দুর্বল অর্থ নৈতিক অবস্থায় একসাথে বেশী লোক বাস করার সুবিধা বেশী। পরিবারভুক্ত উপার্জনশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আয় বেশী হয় না, তাই সব আয় একসাথে ক'রে খরচ করলে অনেকে উপকৃত হয়। এরকম অবস্থায় পরিবারে নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা বেশী থাকে। পরিবার অনেক অনিশ্চয়তা ও আকস্মিক দুর্বিপাক থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং ব্যক্তির নিরাপত্তা বোধ বাড়ায়।

অর্থ নৈতিক প্রগতির ফলে আয়ের পথ বাড়ে। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের কাছে উপার্জনের নতুন পথ খুলে যায়। উপার্জন করতে পারলে স্বভাবতই নির্ভরশীলতা থাকে না।

পরিবার বন্ধন শিথিল হবার এটি বোধ হয় অন্যতম কারণ। আধুনিক বিশ্বে আত্মীয়তা বন্ধনের পরিবর্তে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক বন্ধুত্বের বন্ধনের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। আত্মীয়তা বন্ধনের ভিত্তি স্বরূপ যে বিবাহ প্রথা তার গুরুত্বও নানাভাবে কমে যাচ্ছে। বিবাহ বন্ধন ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বসবাস করছে। বিবাহ বন্ধনের মধ্যে যেমন একটা স্থায়িত্বের আভাষ ছিল বন্ধু হিসাবে একসাথে বসবাসের মধ্যে তা নেই। মানুষ এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে ঝুঁকছে। অনেক দেশে আবার নারী সমাজে নানাদিকে স্বাধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে পরিবারের বন্ধনকে অটুট রাখতে সব কাজের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত। মোট কথা পরিবারের ভিত্তিভূমি

শিথিল হয়ে গেছে। শিশুদের মানুষ করার জন্যও সমাজ ও রাষ্ট্র নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। মা বাবার শিশুকে বড় ক'রে তোলার কিছু আর্থিক দায়িত্ব থাকছে। কিন্তু তার জীবন গড়ে তোলার অনেক দায়িত্ব বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিচ্ছে। শিশুও এরকম পরিবারের বাইরে এককভাবে মানুষ হবার জন্য আত্মকেন্দ্রিক ভাবেই গড়ে উঠছে। মানুষ নিজ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেশী নজর দিচ্ছে। একই পটভূমি-কায় সামাজিক অবস্থার কথাও আলোচনা করতে হবে।

4.4 সামাজিক স্তর বিন্যাস

প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন রকম হয়। স্তর বিন্যাস নানা উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আয় অনুসারে স্তর বিন্যাস অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যাদের আয় বেশী সমাজে তারা উঁচু স্তরের মানুষ। জীবনে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ অন্যদের তুলনায় বেশী। সমাজের বিভিন্ন মানুষদের আমরা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এই তিন শ্রেণীর সামাজিক সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন এবং এদের মানসিকতারও তারতম্য আছে।

উচ্চবিত্ত শ্রেণী সমাজের উপরিভাগে থেকে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের এই কাজে সহায়তা করে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীরা এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিক্ষার স্তর ভেদেও সামাজিক স্তর বিন্যাস হয়। নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষার প্রসার বেশী হয়ে থাকে। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তার ফলে জীবনের সুখ সুবিধা সম্পর্কে ধারণা বাড়ে। কিভাবে জীবনযাপন করা যায় তাও শিক্ষিত মানুষের পক্ষে জানার বেশী সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষের বসবাস প্রণালী জানা থাকে। কিভাবে সেই ধরনের জীবন গঠন করা যায় সে সম্পর্কেও শিক্ষিত মানষের ধারণা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে সম্মানীয়। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে উপার্জনের সুযোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তার বুদ্ধি, বিবেচনা, অতিরিক্ত আয়ের সাহায্যে সহজেই সমাজের উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের ফলে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি হয়। উচ্চ শিক্ষা ব্যয় সাপেক্ষ, সুতরাং নিম্নবিত্তদের উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে সমাজের উঁচুস্তরে পৌছানোর সুযোগ কম। নিম্নবিত্তদের এই ব্যাপারে সুবিধা দেবার জন্য অধুনা অনেক রাষ্ট্রেই সরকার কম বেশী দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

বংশগতিও সামাজিক স্তর বিন্যাসকে প্রভাবিত ক'রে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের

পরিবারে যার জন্ম সে কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা নিয়েই জন্মগ্রহণ ক'রে। আবার তার জীবনপথও সাধারণত সরল হয়ে থাকে। জন্মসূত্রে সে কিছু মর্যাদা পেয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে কিছু সুযোগ সুবিধা পাবার আশাও রাখে। মানুষ এইভাবে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস করেছে তা কৃত্রিম। বুদ্ধির জোরে বা শক্তির জোরে কিছু লোকের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তারপর বংশানুক্রমে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে সমাজের উঁচু স্তরের বাসিন্দা হবার প্রবণতা সমর্থন যোগ্য নয়।

নীতিগতভাবে জন্মসূত্রে সব মানুষই পৃথিবীতে একইরকম সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ নীতি কোনও সমাজেই গ্রাহ্য হয় না। সমতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রে খুব কম মানুষই মেনে চলতে পারে। মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা জন্মসূত্রেই থেকে যায় এবং এই ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে একরকম নয়। আবার আন্তরিক প্রচেষ্টা এই ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে। সকলে একভাবে প্রচেষ্টা চালায় না সেকথাও ঠিক। কিন্তু সামাজিক সুযোগ সুবিধা সব মানুষের একই রকম পাওয়া উচিত। সুযোগ সুবিধার অভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের মানুষ তার স্তর অতিক্রম করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে বঞ্চিত ক'রে উচ্চ স্তরের মানুষ অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে থাকে।

কৃত্রিম সামাজিক স্তর বিন্যাস ক'রে যদি একশ্রেণীর মানুষকে ক্রমাগত বঞ্চনা করা হয় তবে সমাজে অশান্তি দেখা দেবে। এ কারণেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নানা হানাহানি ঘটেছে তার ঐতিহাসিক নজির রয়েছে। বর্তমানকালেও এই শ্রেণীবৈষম্য অনেক অশান্তির মূল কারণ। তবে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সহজ কথা নয়। এ পর্যন্ত কোনও দেশই তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু আয় বণ্টনের বৈষম্য কমিয়ে ও মানুষের জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে দিয়ে সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটান যায়। আবার নিম্ন স্তরের ব্যক্তিরা সমাজ সচেতন হ'লে তারাও নিজেদের দাবী আদায় ক'রে নিয়ে সামাজিক ভেদাভেদ কমিয়ে ফেলতে পারে।

মানুষ সঙ্গী-সাথী না নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না। তাই সে পরিবারের মধ্যে বাস ক'রে ও নিকটবর্তী মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে। আবার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন দূরবর্তী দেশের সঙ্গেও সামাজিক আদানপ্রদান সম্ভব। পেশাগতভাবে দেশ বিদেশে সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার প্রবণতা এখন খুব বেশী। যেমন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, বিভিন্ন দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করছে। এতে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় যেমন সম্ভব তেমনি

৬

এক দেশের ভাবনা অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে উঠায় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম জোরদার হয়েছে।

কোনও দেশেই সামাজিক স্তর বিন্যাস কেউ সচেতনভাবে গড়ে তোলে না। সমাজ সদা সর্বদা গতিশীল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস ঘটে থাকে। একসময়ে পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টধর্মের প্রতি অতি আনুগত্যের ফলে সমাজে ধর্মযাজক শ্রেণী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে বসে। এদিকে শাসকশ্রেণী সর্বদাই জনসাধারণ থেকে নিজেদের একটু পৃথক মনে করে। এবং এই শ্রেণীও সকলের কাছে শ্রদ্ধা সম্মানের আসন দাবী ক'রে। কালক্রমে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থের সংঘর্ষে ধর্মযাজকদের প্রভাব হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম-স্থানের প্রভাব যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছিল। যখন কৃষি কাজই ছিল মনুষ্য সমাজের প্রধান উৎপাদনের ক্ষেত্র তখন ভূস্বামীরা সমাজের উঁচু স্তর অলঙ্কৃত ক'রে থাকত। আবার শিল্পের জয়যাত্রার যুগে শিল্পপতিদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেল। শ্রমিকদের শ্রমের উপর নির্ভর ক'রেই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু শ্রমিকরা অনেক সময় শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না। তাই শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের আয়ের পার্থক্য সমাজে অসন্তোষ ডেকে আনল। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে শ্রমিকেরা তাদের আয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্তর অনেক বাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে।

ভারতের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাসের কথা একটু আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন এখানেও ধনী-দরিদ্রের ভেদ রয়েছে এবং সে প্রভেদের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে অনেক উন্নত দেশের চেয়ে বেশী। এর মূলে রয়েছে ভারতের ভূমি ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা। অতীতে এদেশে পেশাগত ভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কায়িক পরিশ্রমকারীদের নিম্নবর্ণ শ্রেণীতে রেখে এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আয়স্তরের পার্থক্য কি ছিল জানা যায় না। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে আবহমানকাল ধরে শিক্ষা দীক্ষা, আহার বিহার, রুচি প্রকৃতিতে এই বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব কাজ করে গেছে। এই বর্ণ বৈষম্যের উপর ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা আরেকটি মাত্রা এনে দিল। স্বভাবতই উচ্চ বর্ণের অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা চলে আসে। আবহমান-কালের নিম্নবর্ণের মানুষ এই জমি কর্ষণ করে ফসল বানিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে উচ্চ বর্ণের সমৃদ্ধি, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে চলে।

স্বাধীনতার পর বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থ নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তন দ্রুততর হয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ভারত

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী। কিন্তু 1955 সনে যেখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা 14·3 ভাগ ভারতে বসবাস করত ; 1984 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা 15·7 ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।[1] এ বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা দুরূহ ব্যাপার।

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তন ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বৃদ্ধি। শহরবাসীরাই বেশী পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেন। 1960 সন থেকে 1983 সনের মধ্যে ভারতে নগরবাসীদের হার শতকরা 18 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 24এ দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবীতে ওই সময়ের মধ্যে এই হার 34 থেকে 40-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1983 সনে মোট উৎপাদনের (**Gross National Product**) এর ক্ষেত্রে ভারতের স্থান একাদশ ; কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদনে (**Per Capita GNP**) ভারতের স্থান 169তম। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ওই বৎসর ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তালিকায় যথাক্রমে ষোড়শ, একবিংশতি ও একাদশ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সামগ্রীগুলি উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তাই শিল্পায়নের অগ্রগতি এদেশে আশানুরূপ নয়। 1960-83 এর মধ্যে বাৎসরিক গড় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার 5·4। এখনও জনসংখ্যার শতকরা 60 জন মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি-নির্ভরশীল গ্রামীন সমাজে প্রাচীন সামাজিক স্তর বিন্যাস বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। চিরাচরিত সামাজিক প্রথা বহু অঞ্চলেই চলে আসছে। অবশ্য এই সব প্রথায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। দেশের নগরাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ধনিকশ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রা প্রণালী বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে তার প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় না। নাগরিক জীবনে আঞ্চলিক পার্থক্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

4·5 জীবনযাত্রার মান ও উৎকৃষ্ট জীবনস্তর সূচক—

বর্তমান যুগে উন্নয়নের প্রসঙ্গ উঠলে সকলেই জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা বলে থাকেন। জীবনযাত্রার মান বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি ? মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন। কিন্তু এই তিনটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষের নানা প্রকার ভেদ আছে। অতি সাধারণ খাবার পেটভরে না খেয়েও মানুষ অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। পুষ্টির অভাবে ক্ষুদ্রকায় শীর্ণ মানুষ আমাদের অচেনা নয়। আবার দেশ বিদেশের সুস্বাদু, দামী খাবারের অভাব নেই।

সুস্থ শরীরে উপযুক্ত কর্মক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। বয়স, শ্রমের পরিমাণ, দেশের জলবায়ু ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে—বিভিন্ন

ধরনের মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুষম খাদ্য তালিকা হয়ে থাকে। মানবদেহে বিভিন্ন অবস্থা কি পরিমাণ ক্যালরীর প্রয়োজন এবং তা কোন কোন খাদ্য থেকে আহরণ করা যায় সে সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়ে থাকে। জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে খাদ্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রথমেই চাই উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য।

খাদ্যের পরেই বস্ত্রের স্থান। বস্ত্রের প্রয়োজন জলবায়ু অনুসারে তারতম্য ঘটে। বস্ত্র শুধু লজ্জা নিবারণ বা সাজ পোষাকের জন্যই যে প্রয়োজনীয় তা নয় প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা থেকে আচ্ছাদন মানুষকে রক্ষা করে। এখানেও দেখা যায় দরিদ্র মানুষ হয়ত অতিরিক্ত শীতের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছে না।

আবার ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন পোষাক আর নানা সাজসজ্জার উপকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদিতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করে চলেছে। এই একই কথা বাসস্থান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বিরাট অট্টালিকার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে এমন কুঁড়ে ঘর আমাদের দেশে অজানা নয়। জীবনযাত্রার মান অর্থে আমরা বুঝি সুষম খাদ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত আচ্ছাদন, ও পরিবেশের উপযোগী কিছুটা আরামদায়ক বাসস্থান। দেশের অর্থ নৈতিক স্তরের উপর কি ধরনের জীবনযাত্রার মানে জনসাধারণকে অভ্যস্ত হতে হবে তা স্থির হয়। মানুষকে উন্নত জীবনযাপন করতে হলে শুধু নিম্নতম প্রয়োজন মেটালেই চলবে না। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। রোগের চিকিৎসা, অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া এগুলিও উন্নততর জীবনযাত্রা প্রণালীর অঙ্গ। এছাড়া শিল্পোন্নয়নের ফলে বর্তমান পৃথিবীতে নানারকম ভোগ্যদ্রব্যের প্রচলন হয়েছে। এই সব ভোগ্যদ্রব্য প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে। জীবনযাত্রার মানকে নির্দিষ্ট স্তরে আনতে হলে এই সব ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

জীবনযাত্রার মান প্রধানত আয়স্তরের উপর নির্ভর করে। তবে সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত রুচি ভোগের ইচ্ছা ইত্যাদিও ব্যয় স্তরকে প্রভাবিত করে জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রিত করে। সাধারণত শিল্প সমৃদ্ধ দেশে জীবনযাত্রার মান উঁচু স্তরের হয়। প্রথমত শিল্পে অগ্রগতি অন্য নানাদিকে কাজের সুযোগ এনে দেয়। নানাভাবে আয় বাড়ে। শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে নগরমুখী সভ্যতা গড়ে ওঠে। শহরে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে মানুষ বসবাস করে বলে এখানে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্য উপকরণের প্রয়োজন বেশী। পরস্পরের জীবনযাত্রা প্রণালী অনুকরণের ঝোঁকও ভোগ্য পণ্যে ব্যয় বৃদ্ধি করে। এইভাবে উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী দেখা দেয়। অবশ্য ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি যে সব সময় উন্নত মানের সৃষ্টি করে তা নয়।

বাহ্যিক আড়ম্বর বা অসঙ্গত বিনোদন ব্যয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক নয়। উপযুক্তভাবে ব্যয় করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। নয়ত আয় বৃদ্ধি অপচয়ের বোঝা বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রগতিকেও ব্যাহত করবে।

বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা 'উৎকৃষ্ট জীবন' (**quality life**) কাকে বলা যাবে তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রগতির সূচক। আবার মোট আয় ও উৎপাদন যে হারে বাড়ে জনসংখ্যা যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তবে মাথাপিছু আয় বাড়বে। এর সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর হলে সকল মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলেই কি উন্নত জীবনযাপন করা যায় ?

ব্যক্তিগতভাবে এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। এর সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বও জড়িত। কিন্তু অর্থনীতিবিদ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উন্নত জীবন প্রণালীর আলোচনা করতে গেলে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে যেতে পারেন না। গাণিতিক পরিমাপ গঠন করেই তাকে এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজতে হবে।

সমাজ উন্নত জীবনে উত্তীর্ণ কিনা জানবার জন্য একটি 'উৎকৃষ্ট জীবন স্তর' সূচক (**Physical quality of life index**) গঠন করা হয়েছে। এই সূচক নির্ধারণের জন্য তিনটি বিষয়কে একসাথে নেওয়া হয়। এই তিনটি হল 15 বছর উর্ধ্বে জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার হার 1 বছর বয়সের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ও শিশু মৃত্যুর হার। এর কোনটির একটির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। অধ্যাপক মরিস, ডি. মরিস এই সূচক গঠন করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছেন। এই সূচক গঠন করার সময় তিনটি সংখ্যাকেই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা স্কেলে রূপান্তরিত করতে হয়।

যেমন 1981 সনের ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার কেরালায় সবচেয়ে বেশী 70.42%। অরুণাচলে সবচেয়ে কম 20.79%। পশ্চিমবঙ্গের হার 40·94%। পশ্চিমবঙ্গের সূচক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হ'লে সাক্ষরতার মান হবে

$\frac{41-21}{70-21} \times 100 = 40.8\%$ তেমনি শিশু মৃত্যুর হার 1970 সনে উত্তরপ্রদেশে

হাজারে 160 জন ও কেরালায় 50 জন। এ দুটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান। পশ্চিমবঙ্গে এই হার হাজারে 100 জনের কাছাকাছি। সূচকে ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা

$\frac{160-100}{160-55} \times 100 = 57\%$। তিনটি সংখ্যার একই স্কেলে গৃহীত তিনটি মানকে

যদি আমরা ক 1 ক 2 ও ক 3 রূপে সূচিত করি তবে উৎকৃষ্ট জীবনস্তর সূচক= $\frac{\text{ক } 1+\text{ক } 2+\text{ক } 3}{3}$

এই অতি সাধারণ সূচকটি নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি? অধ্যাপক মরিসের মতে এই সূচকের সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের স্তরে একটা আভাষ পাওয়া যায় এবং পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও করা যায়। এই তথ্যগুলি সমগ্র জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সহজে পরিমাপ করা যায়। এগুলিকে অর্থের সাহায্যে পরিমাপ করতে হয় না। সুতরাং বিভিন্ন দেশের অর্থমূল্যের বিভিন্নতা এদের পক্ষপাতদুষ্ট করে না। সামাজিক সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকলেও এই সূচক তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। আবার এই সূচকটি সামগ্রিক এবং আংশিক দুইভাবেই পরিমাপ করা সম্ভব। আংশিক পরিমাপকে সামগ্রিক পরিমাপের সঙ্গে তুলনা করাও সম্ভবপর হয়। যেমন ভারতের তপশীল জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য যদি পৃথকভাবে এই সূচক পরিমাপ করা যায় তবে জাতীয় সূচকের সঙ্গে তুলনা করে অনগ্রসরতা স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়।

তবে যত সহজ পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন উন্নয়নশীল দেশে এই সূচকে ব্যবহৃত তথ্যও অনেক সময় সংগ্রহ করা যায় না। এই সূচকের মধ্যে সমাজ জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে বলা চলে না। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আন্তর্দেশীয় তুলনা বা উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এই সূচকের উপযুক্ত ব্যবহার হতে পারে। উন্নত দেশে সাক্ষরতার হার, জীবনাশা দুটি উচ্চমানের এবং শিশু মৃত্যুর হার যথেষ্ট কম। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক তুলনায় এই সূচকের ব্যবহারে তেমন কোনও ফললাভ হবে না।

অধ্যাপক মণি মুখার্জি 2167টি দেশের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য নিয়ে এই সূচক নির্ধারণ করেছেন। দেশগুলিকে মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণভাবে যেসব দেশের মাথাপিছু গড় উৎপাদন বেশী তাদের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 93 থেকে 95 এর মধ্যে। মাথাপিছু মোট উৎপাদন মূল্য 2150 ডলার পর্যন্ত হ'লেই উৎকৃষ্ট জীবনস্তর সূচক এই মান অর্জন করতে পারে। পরবর্তী স্তরে এই সূচকের মানের বেশী পরিবর্তন হয় না। অপরপক্ষে মাথাপিছু মোট উৎপাদন 1660 ডলার পর্যন্ত থাকাকালে এই সূচকের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। এই স্তর পর্যন্ত ছ'টি শ্রেণীতে সূচকের মান 31 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 83তে উঠেছে। অপরপক্ষে এর পরবর্তী 5টি শ্রেণীতে সূচক 93 থেকে 95 এর মধ্যে রয়েছে।

শ্রী মুখার্জী ভারতে 1971 সনের তথ্য দিয়ে 15টি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সূচক সংখ্যার

পরিমাপ করেন। সর্বভারতীয় স্তরে এই সূচকের মান 34·3 কেরালায় এই সূচক সর্বোচ্চ (100) তারপরেই আসছে পাঞ্জাব (61·60)। 15টি রাজ্যের মধ্যে 7টির সূচক সর্বভারতীয় স্তরের নীচে ও 8টি রাজ্যের স্থান সর্বভারতীয় স্তরের উপরে। মাথাপিছু উৎপাদনের সঙ্গে এই সূচকের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। মাথাপিছু উৎপাদন পাঞ্জাবে সবচেয়ে বেশী। সূচকের স্তর বিন্যাসে এ রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়। আবার বিহারে মাথাপিছু উৎপাদন সবচেয়ে কম, সূচকের স্তর অনুসারে এর নীচে আরও 4টি রাজ্য থাকলেও বিহারে সূচকের মান কম (23·4)। সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে 1901 সন থেকে দশ বৎসর অন্তর এই সূচক পরিমাপ করে শ্রী মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে 70 বছরে অতি ধীরগতিতে সূচকের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রদত্ত হিসাব নিচে দেওয়া হ'ল।

বৎসর	1901	1911	1921	1931	1941
সূচক সংখ্যা	8·32	0·79	24·32	32·20	44·22
বৎসর	1951	1961	1971		
সূচক সংখ্যা	65·50	83·84	100		

1950-51 কে ভিত্তি বৎসর[3] ধরে ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের সূচক সংখ্যা 1970-71 ও 1985-86 সনে যথাক্রমে 204·6/135·8 এবং 345·8/164·6 দেখা যাচ্ছে। ওই দুই বৎসর মাথাপিছু ভোগের সূচক সংখ্যা যথাক্রমে 134·6 ও 160·1 পরিমাপ করা হয়েছে। 1950-51 থেকে 1985-86র মধ্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের সূচক বৃদ্ধির হার বাৎসরিক গড়পড়তা 2·8 ও 5.6।

4·6 ভারতের জনসংখ্যার গুণগত বিচার :-

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই সাথে 'উৎকৃষ্ট জীবন স্তর সূচক'ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে দেশের নানাদিকে অগ্রগতি হয়েছে। জীবনের বিভিন্ন দিকে গুণগত উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে বিগত কয়েক দশকের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল এই উৎকর্ষের পরিচয় বহন করছে। সারণি 4.1 এর তথ্যানুসারে 1931-40 থেকে 1976-80র মধ্যে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 21 বৎসর ও পুরুষদের ক্ষেত্রে 20 বৎসর জীবনাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কোনও উন্নয়নশীল দেশেই জন্ম সময়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ। এর দ্বারা জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে বোঝা যায়। গুণগত বিচারে জনগণ একধাপ এগিয়েছে।

সারণি 4 : 1

ভারতে জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের গতি[4]

1931-40 থেকে 1976-80

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	1931-40	1941-50	1951-60	1961-70	1970-75	1976-80
স্ত্রী	31·4	31 7	40·6	44·7	49·0	52·1
পুরুষ	32·1	32·4	41·9	46·4	50·5	52·5

জনজীবনে স্বাস্থ্যের সাথে সাথে শিক্ষার গুরুত্বও কিছু কম নয়। শিক্ষাক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য পরিমাপ সাক্ষরতার হার। পরিকল্পনাকালের সূচনা থেকে পর পর চার বছরের আদমসুমারীর সাক্ষরতার হার নীচে দেওয়া হ'ল।

সারণি 4 : 2

ভারতে স্ত্রী পুরুষ ও সাধারণ সাক্ষরতার হার[5]

1951-1981

সাক্ষরতার শতকরা হার

বর্ষ	সাধারণ	পুরুষ	স্ত্রীলোক
1951	16·7	25·0	7·9
1961	24·0	34·4	13·0
1971	29·5	39·5	18·7
1981	36·2	46·7	24·9

30 বছরে সাক্ষরতার হার বেশ কিছু বৃদ্ধি পেলেও এখনও ফলাফল আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকেরা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তেমনি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সব অঞ্চলের অগ্রগতি একরকম নয়। 1961, 1971 ও 1981র আদমসুমারীর তথ্য আলোচনা করলে দেখা যায় সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাক্ষরতার হার কিছু কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। 1961 সনে সাক্ষরতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার ছিল যথাক্রমে শতকরা 52·7 ও 3·74 ভাগ। দিল্লী ও পণ্ডিচেরী এই দুটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে এই দুই হার পরিলক্ষিত হয়। 1971 সনে চণ্ডীগড় সাক্ষরতা হারে (61·56%) সবচেয়ে উপরের স্থান অধিকার ক'রে। সর্বনিম্ন হার দেখা যায় অরুণাচল প্রদেশে (11·29)। 1981 সনে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে 20·79% হয়েছে। কিন্তু অরুণাচলে এখনও স্কেলের সবচেয়ে নীচে। সাক্ষরতার সর্বোচ্চ স্থানে এখন কেরালা (70·42%)। দুটি অঞ্চলের তফাৎ প্রায় শতকরা 50 ভাগ। 1981 সনের আদম-সুমারীতে সর্বভারতীয় সাক্ষরতার হারের সঙ্গে আঞ্চলিক হারের তুলনা ক'রে দেখা যায় যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র অরুণাচল প্রদেশ ও দাদরা নগর হাভেলী

ছাড়া সর্বত্রই সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় হারের উর্ধ্বে ও শতকরা 50 এর বেশী। অপর পক্ষে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে 9টি রাজ্যের সাক্ষরতার হার ভারতীয় হারের নীচে থাকছে এবং কেরালা ছাড়া অন্য কোন রাজ্যেই সাক্ষরতার হার শতকরা 50 এ আসেনি। সাক্ষরতা বৃদ্ধি পাওয়া নিঃসংশয়ে একটি শুভ সূচনা। কিন্তু এক্ষেত্রে আরও কিছু করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

সাক্ষরতা জ্ঞানই শিক্ষার একমাত্র পরিমাপ নয়। বরং সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঠিক শিক্ষিত বলা চলে না। শিক্ষার রকমফের আছে। শিক্ষার স্তর অনুসারে জন-সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ আদমসুমারীর তথ্যর সাহায্যে করা হয়ে থাকে। 1971 সনের[6] সংগৃহীত তথ্যে দেখা গেছে যে শতকরা 29 জন সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়দের মধ্যে আবার শতকরা 10 ভাগের শুধুমাত্র অক্ষর পরিচয় আছে। তাহলে কেবলমাত্র শতকরা 19 ভাগ মতন মানুষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হয়েছেন। সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে স্নাতক ও তার উর্ধ্বে মাত্র মোট জনসংখ্যার শতকরা 0.64 ভাগ পৌঁছাতে পেরেছে।

শিক্ষার মতন জনগণের বৃত্তি বা পেশাও মানুষের এক বিশেষ দিককে প্রকাশিত ক'রে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ সুতরাং কর্মক্ষম জনসমষ্টির একটি বড় অংশ কৃষি নির্ভরশীল। তবে অধুনা উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলে বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ ঘটছে। কৃষি ভিন্ন অন্য বৃত্তিতে নতুন ধরনের কর্মদক্ষতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং লোকে নানারকম কাজ শেখে ও অভিজ্ঞতা বাড়ে। 1981 সনের আদমসুমারীতে মোট উপার্জনকারী ব্যক্তিদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দুইভাগ কৃষি নির্ভরশীল। অন্য দুই ভাগের মধ্যে তৃতীয়টিতে গৃহভিত্তিক শিল্প ও চতুর্থটি অন্য সব কাজকে একসাথে দেখান হয়েছে। যারা বছরের অধিকাংশ সময় কাজ করে থাকে সেই 'মুখ্যকর্মী' (main worker) দলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থেই বোধহয় 1961, 1971 ও 1981 সনের চারটি শ্রেণীর মধ্যে এদের বিভাজন 1981র প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।

সারণি 4 : 3

বৃত্তি অনুসারে কাজে নিযুক্ত মানুষের শ্রেণীবিভাগ[7]
কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মোট জনসংখ্যার শতকরা হার
(তিনটি আদমসুমারী বৎসরে)

কাজের শ্রেণীবিভাগ	1961	1971	1981
প্রথম	42·98	33·06	33·45
দ্বিতীয়	7·33	8·33	8·34
তৃতীয়	2·75	1·18	1.16
চতুর্থ	10·34	8·81	10·04

তিনটি আদমসুমারীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এদেশে পেশাগত পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয়নি।

সাধারণভাবে বিচার করলে জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। নতুন ভোগ্য সামগ্রীর ব্যবহার বেড়েছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, সাজসজ্জার নানা উপকরণের সঙ্গে আজ এদেশের মানুষ অনেকটাই পরিচিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ট্রানজিস্টার খুব জনপ্রিয়। শহরাঞ্চলে টি. ভি.র প্রসার বাড়ছে। এর ফলে কতটা উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য India in the World, December 1985, Economic Intelligence Service ; Centre for Monitoring Indian Economy, Bombay.
2. দ্রষ্টব্য Physical Quality of life Index—Sri M. M. Mukherjee July 1979, Economic Intelligence Service, C.M.I.E, Bombay.
3. দ্রষ্টব্য India's Economic Growth 1950-51 to 1985-86 December 1985, Economic Intelligence Service ; C.M.I.E. Bombay.
4. দ্রষ্টব্য S R S Bulletine Vol XVIII No 1 June 1984.
5. দ্রষ্টব্য Basic Statistics Relating to Indian Economy Vol I September 1981
   Economic Intelligence Service ; C.M.I.E. Bombay.
6. দ্রষ্টব্য 1971 Census—A Statistical Outline, A. Chandrasekhar —Population in India's Development 1947—2000.
7. দ্রষ্টব্য Census of India 1981
   Primary Census Abstract—General Population Part II B (i)

পঞ্চম অধ্যায়

জনসংখ্যার পরিমাপ ও প্রক্ষেপ আন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিপ্রক্ষেপণ রীতি

জনসংখ্যা তথ্য জানবার প্রধান উৎস আদমসুমারী। কিন্তু আদমসুমারী নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, কৃষি প্রকল্প রচনা প্রভৃতি কাজের জন্য আদমসুমারীর মধ্যবর্তী সময়ের সঠিক তথ্য জানবার প্রয়োজন হতে পারে। আবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্যও জনসংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সাধারণত তিন ধরনের পরিমাপ ও প্রক্ষেপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। (1) দুটি আদমসুমারীর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পরিমাপ (2) একটি আদমসুমারীর পরবর্তী নিকটবর্তী সময়ের পরিমাপ। (3) দূরবর্তী সময়ের জন্য ভবিষ্যৎ জনসংখ্যর প্রক্ষেপ। এই ধরনের পরিমাপ সারা দেশের জন্যেও করা যায়, আবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পৃথকভাবে করা যায়।

কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক রীতির উপর ভিত্তি না করেও জনসংখ্যার পরিমাপ করা যায়। অতীতকালে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বা বিদেশী ভ্রমণকারীরা আন্দাজে নির্ভর করে এই ধরনের অনিশ্চিত তথ্য দিতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার পরিমাপ দেওয়া হত। কখনও কখনও বিশেষ তথ্য যেমন করদাতার সংখ্যা, গৃহের সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে গুণকের সাহায্যে মোট জনসংখ্যার পরিমাপ করা হত। অতীতকালের পৃথিবীর জনসংখ্যার যে হিসাব দেওয়া হয়ে থাকে সেটি এক ধরনের অনুমান। বর্তমানকালে জনসংখ্যার পরিমাপ অনেক বেশী তথ্য নির্ভর ও নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম অনুসারে এই ধরনের পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

প্রথমত উপাদানগত নীতিতে পরিমাপ বা প্রক্ষেপ করা সম্ভব। দুটি লোকগণনার মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা নির্ধারণ করতে হলে আদমসুমারীর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ সঠিক জানা চাই। ধরা যাক প্রথম বছরে এর পরিমাণ $জ_1$। $জ_1$ এর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে 3 বছরের সাধারণ বৃদ্ধি ও নীট পরিযান যোগ করলে $জ_4$ পাওয়া যায়।

$জ_4 = জ_1$ + (তিন বছরের মোট জন্মসংখ্যা)-ওই সময়ে মোট মৃতের সংখ্যা + নীট পরিযান। কিন্তু দুটি আদমসুমারীর ফলে যে বৃদ্ধি সত্য সত্যই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ $জ_{10} - জ_1 = ব$ হলে এই ব'কে দশ বছরের বণ্টন করলে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যা যা হবে উপাদানগত নীতিতে অন্তর্প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা তার সঙ্গে সমান নাও হতে পারে। অর্থাৎ দুটি আদমসুমারী অন্তর্বর্তীকালীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণ উপাদানগত রীতিতে প্রক্ষেপিত পরিমাপের থেকে পৃথক হবার সম্ভাবনা। এই দুটি সংখ্যার পার্থক্যকে সাধারণত সমাপ্তির ত্রুটি হিসাবে ধরা হয়। এই ত্রুটির পরিমাপ করাও সম্ভবপর। যেমন পশ্চিমবঙ্গের 1971 সনের আদমসুমারীর জনসংখ্যা 44312011। উপাদানগত নীতি অনুসারে 1974 এর জনসংখ্যার পরিমাপ করতে হলে জন্ম, মৃত্যু ও নীট পরিযানের তথ্য আবশ্যক। স্বাস্থ্যদপ্তরের জন্ম মৃত্যু পরিসংখ্যান থেকে এই তিন বছরে যথাক্রমে 1120284টি শিশু জন্মেছে ও 505761 জন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 1971 সনের প্রতিবেদন থেকে ওই সময় নীট পরিযান 1365460 পরিমাপ করা গেল। তাহলে 1974 সনের জনসংখ্যা

$জ_4 = 44312011 + 1120284 - 505761 + 1365460$
$= 46291994$। আবার 1971 থেকে 1981 এর মধ্যে আদমসুমারীর

তথ্য অনুসারে জনসংখ্যা গড়ে বাৎসরিক 2.31 হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হার প্রয়োগ করলে 1974 সনের জনসংখ্যার পরিমাপ হবে 47392602 জন। অতএব সমাপ্তির ত্রুটি 11 লক্ষ মতন।

বয়স ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ বজায় রেখে জনসংখ্যার পরিমাপ হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে উপাদানগত নীতিতে জনসংখ্যার বহিঃপ্রক্ষেপণ করতে হলে বয়স ও লিঙ্গ ভেদ করে নেওয়া সুবিধাজনক। এইভাবে প্রক্ষেপ করতে হলে সর্বশেষ লোকগণনার তথ্য বা সর্বাধুনিক জনসংখ্যার পরিমাপকে ভিত্তি হিসাবে নিতে হবে। সাধারণত ভিত্তি বছরের জনসংখ্যাকে পাঁচ বছর করে একসাথে নিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি শ্রেণীতে জন্মসংখ্যা জীবিতের সংখ্যা পরিযানগত অবস্থা পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর বয়স শ্রেণীগত অবস্থা পৃথকভাবে জেনে নিয়ে মোট জনসংখ্যা নির্ধারিত হয়। দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সময়ের প্রক্ষেপণে একই রকম নীতি গ্রহণ করা হয়। বহিঃপ্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সমাপ্তির ত্রুটি গ্রাহ্য করা সম্ভবপর হয় না।

উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করেও জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়। একটি ছোট অঞ্চলের আদমসুমারী বা তার নিকটবর্তী সময়ের জনসংখ্যার পরিমাপকে সেই অঞ্চলে যে বৃহত্তর অঞ্চলের অংশরূপে পরিগণিত সেই বৃহত্তর অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অনুপাত

হিসাবে প্রকাশ করা হয়। বৃহত্তর অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিমাপ মোটামুটি সঠিক হওয়া চাই। অতঃপর অতীত অনুপাতের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ ধারা নির্ধারণ করা হয়। এই ধারাকে কাজে লাগিয়ে আবার ভবিষ্যতে আংশিক বা পূর্ণ অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যেমন 1961, '71, '81 সনের আদমসুমারীর তথ্যানুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা 8 ভাগের কাছাকাছি। পঞ্জীয়ন দপ্তরের একটি প্রতিবেদনে 1991 সনে ভারতের প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা 83·6 কোটি দেখান হয়েছে। তাহলে ওই বৎসর পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা হার আনুমানিক 6·8 কোটি। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক নির্দেশকের সঙ্গে জনসংখ্যার যোগসূত্র খুঁজেও উভয়ের মধ্যে সহগতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সহগতি (correlation) একই রকম থাকবে এই ধারণা করে পরবর্তীকালে নির্ভরণের (regression) এর সাহায্যে জনসংখ্যার পরিমাপ সম্ভব হতে পারে।

জনসংখ্যা পরিমাপও প্রক্ষেপের জন্য কিছু গাণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার করাও হয়ে থাকে। যদি মনে করা হয় যে জনসংখ্যা দুটি আদমসুমারীর অন্তর্বর্তীকালে একই হারে বেড়ে চলেছে তাহলে এই অন্তর্বর্তীকালের যেকোনও সময়ে অন্তঃপ্রেক্ষেপণ সহজে হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ের জনসংখ্যা যেন একটি সরলরেখার উপরের বিন্দু সমষ্টি। যদি দুটি আদমসুমারীর জনসংখ্যা $জ_1$ ও $জ_{10}$ হয় তবে অন্তর্বর্তীকালীন জনসংখ্যা, ধরা যাক, $জ_3 = জ_1 + \frac{3}{10} \times (জ_{10} - জ_1)$ হতে পারে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের 1971 ও 1981 এর আদমসুমারী অনুসারে মোট জনসংখ্যা যথাক্রমে 4·43 ও 5·45 কোটি। সেক্ষেত্রে 1974 সনের জনসংখ্যার পরিমাপ $= 4{\cdot}43 + \frac{3}{10}(5{\cdot}45 - 4{\cdot}43) = 4{\cdot}43 + {\cdot}30 = 4{\cdot}73$ কোটি অংশ বিশেষের জনসংখ্যার পরিমাপ এইভাবে নিয়ে তাদের সমষ্টিকেও মোট জনসংখ্যা বলা যেতে পারে।

আদমসুমারীর ঠিক পরবর্তী সময়েও এইভাবে জনসংখ্যার পরিমাপ করা সম্ভব। ধরা যাক $জ_1$ ও $জ_{10}$ এর তথ্য আদমসুমারীর সাহায্যে সংগ্রহ করা হল। (1971 ও 1981 সন) $জ_{12}$র তথ্যর প্রয়োজন আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে $জ_{12} = জ_{10} + \frac{2}{10} \times (জ_{10} - জ_1)$ বলা যায়। এইভাবে দূরবর্তী সময়ের জনসংখ্যা প্রক্ষেপও সম্ভবপর। এই জাতীয় প্রক্ষেপে জনসংখ্যা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধরা হয়। যেমন 1983র পশ্চিমবঙ্গের প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা $5{\cdot}45 + \frac{2}{10}(5{\cdot}45 - 4{\cdot}43) = 5{\cdot}45 + {\cdot}20 = 5{\cdot}65$ কোটি।

ম্যালথাসের তত্ত্বে জনসংখ্যার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। লেখচিত্রের সাহায্যে জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদী গতিকে উপস্থাপিত করলে সরলরেখার পরিবর্তে বোধ

হয় গতিপথটি একটু ভিন্নরূপ ধারণ করবে। সেক্ষেত্রে গাণিতিক হার গ্রহণ করা যুক্তি-সংগত নয়। ধরা যাক চ জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে : অতএব $জ_2 = জ_1 + চ\,জ_1$ $জ_3 = জ_2 + চ\,জ_2$ $জ_4 = জ_3 + চ\,জ_3$ আরও বিশদ করলে দেখা যাবে যে—

$$জ_2 = জ_1(1+চ);\; জ_3 = জ_2(1+চ) = জ_1(1+চ)(1+চ) = জ_1(1+চ)^2;$$
$$জ_4 = জ_3(1+চ) = জ_1(1+চ)^2(1+চ) = জ_1(1+চ)^3;$$

এইরূপে অন্যান্য বৎসরের ক্ষেত্রেও এই ফর্মুলাকে প্রসারিত করা যাবে এবং বৃদ্ধির হারের সঠিক ধারণা করে নিতে পারলে এর সাহায্যে অন্তঃপ্রক্ষেপণ ও বহিঃপ্রক্ষেপণ দুটি কাজই সম্ভবপর হবে।

এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য নির্ভরযোগ্য ফর্মুলা গঠন করা সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জ্যামিতিক হার গ্রহণ করাই শ্রেয়। তবে সূক্ষ্মবিচারে না গেলে গাণিতিক হার গ্রহণ করা যায়।

অঙ্কের সাহায্যে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করতে হলে বেশ কিছু আদমসুমারীর পরপর তথ্য জানা দরকার। এই তথ্যগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জনসংখ্যা কিভাবে প্রক্ষিপ্ত হবে তা স্থির করা যেতে পারে। আবার জনসংখ্যার গতি লেখচিত্রে সরলরেখা ছাড়াও নানারকমভাবে উপস্থাপিত হতে পারে এবং জনসংখ্যার গতিপথ পর্যালোচনা করে সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যার নানারকম গাণিতিক সহগ (Function) নির্ধারিত হয়। এইসব সহগের ধ্রুবক (Parameter) নির্দিষ্ট ফর্মুলার সাহায্যে নির্ধারণ করে সহগের সর্বজনীনতা আনা হয়।

এই ধরনের গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে জনসংখ্যা প্রক্ষেপের মূল ধারণা হল যে পুরাতন তথ্য থেকে যে ধরনের পরিবর্তনের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে তাকে নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যকারণ দ্বারা বিশেষিত করে ওই একইভাবে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাও পরিচালিত হবে মনে করে নেওয়া। যদিও জনসংখ্যা প্রক্ষেপের গাণিতিক বিশ্লেষণের ধারণা নেহাৎ নতুন নয় এই পদ্ধতির কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত গাণিতিক পদ্ধতি মোট জনসংখ্যার ধারণা দেয়। কিন্তু জনসংখ্যার গঠনের পরিবর্তন হল কিনা সে সম্পর্কে এই পদ্ধতি নীরব। জনসংখ্যার বয়স বা লিঙ্গ বিশেষিত গঠন পরবর্তীকালের প্রক্ষেপের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আবার জনসংখ্যার গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে নীতিনির্ধারণ অসুবিধাজনক হয়। দ্বিতীয়ত গাণিতিক কার্যকারণ সম্পর্ক অনেকগুলি সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন একটি দেশের দশ বছরের আদমসুমারী মোট জনসংখ্যার তথ্য নিয়ে হয়ত একটি নির্দিষ্ট ধরনের সহগ গঠন

করা হল। এখন এই কার্যকারণ সম্পর্কে যদি মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যার পরিমাপ নেওয়া হয় তবে তা প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে সমান হবে না। তৃতীয়ত এই ধরনের গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ধরে নিতে হবে জনসংখ্যার পরিবর্তনের হার একই রকম রয়েছে বা একই রকম থাকবে।

তাহ'লে ধরে নিতে হয় যে সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে সেগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে। গতিশীল সমাজে এই জাতীয় ধারণা করার কোনও সুসঙ্গত যুক্তি নেই।

জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে উপযুক্ত বিশ্লেষণ করা দরকার। কোন কোনও ক্ষেত্রে উপাদানগত নীতি বেশী নির্ভরযোগ্য মনে হতে পারে। এই নীতিতে পৃথকভাবে জন্ম মৃত্যুর সঠিক তথ্য গ্রহণ করা হয়। পরিযানগত তথ্য নিয়ে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ পরিযানের নীট অবস্থা অর্থাৎ বহির্গমন ও অন্তর্গমন-এর তথ্য পুরোপুরি সংগ্রহ করা সহজ নয়। পরিযান সামাজিক, অর্থনৈতিক বহুবিধ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পরিযানকারীদের বয়স বিশেষিত গঠন ও স্ত্রী পুরুষ অনুপাত জানা দরকার। পরিযানের তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে নীট আগমনকারীদের মধ্যে পরিবর্তনের গতি নির্ধারণের জন্য বয়স বিশেষিত জন্ম মৃত্যু হার তথ্য পেলেও সুবিধা হয়।

জনসংখ্যা প্রক্ষেপের কোনও প্রণালীই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। বিভিন্নভাবে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার গড় হিসাব নিয়ে অনেক সময় নির্ভরযোগ্য পরিমাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু বিভিন্ন রীতিতে গঠিত প্রক্ষেপের ফলাফল বিভিন্নরূপে হয় সাধারণত একাধিক ফলাফল উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। নানা ধরনের ধারণাকে ভিত্তি করে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন বা উচ্চ-নিম্ন পরিমাপের হিসাব দেওয়া হয়। উচ্চ ও নিম্নের গড় নিয়ে বা মধ্য পরিমাপকে নিয়ে কাজ চালান যেতে পারে।

জনসংখ্যা পরিমাপ ও প্রক্ষেপের ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রক্ষেপণের থেকে বহিঃপ্রক্ষেপণ গুরুত্ব বেশী। প্রক্ষেপিত হিসাব জনসংখ্যার গতি সম্পর্কে সম্ভাব্য ধারণা দেয়। এই হিসাব কখনও পুরোপুরি সঠিক হয় না। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদী প্রক্ষেপ বেশী নির্ভরযোগ্য। দীর্ঘমেয়াদী প্রক্ষেপের ভবিষ্যতে প্রকৃত অবস্থার থেকে পৃথক হবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ যেসব ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই পরিমাপ করা হয়েছিল সেইগুলি হয়ত পরবর্তী-কালের সঠিক অবস্থা সূচনা করেনি।

জনসংখ্যার পরিমাপ যাতে নির্ভরযোগ্য হয় সেজন্য কতকগুলি বিষয় নজর রাখতে হবে। প্রথমত কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে পরিমাপ করা হচ্ছে—আদমসুমারী, নমুনা সমীক্ষা, আংশিক নমুনা সমীক্ষা বা আংশিক পঞ্জীয়ন, সাধারণ ধারণা। সবকটি

পদ্ধতি ভিত্তি সংখ্যা দিতে পারলেও প্রথম পদ্ধতিটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। যদি উপযুক্ত নিয়ম মেনে দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে সেটির উপরও নির্ভর করা চলে। ছোট দেশে শাসনযন্ত্র দক্ষ হ'লে তৃতীয় পদ্ধতিও নেহাৎ খারাপ নয়। চতুর্থ পরিমাপের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয়ত ভিত্তি সংখ্যার সময়সূচীর সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যত নিকটবর্তী ভিত্তি বছর পাওয়া যায় ততই ভাল। প্রক্ষেপণের সময় ভিত্তি বছরও প্রক্ষেপিত সংখ্যার যে বছরের জন্য প্রযোজ্য দুটিকেই উপযুক্তভাবে নির্দেশ করে দিতে হবে।

একসময় থেকে আরেক সময়কালে উত্তীর্ণ হতে গেলে অন্তর্বর্তীকালের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এজন্য ধারাবাহিক পঞ্জীয়ন সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক দেশেই পঞ্জীয়ন ব্যবস্থা তেমন দৃঢ় নয়। সুতরাং অন্যসূত্রে জন্মহার, মৃত্যুহার ও পরিযানের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। জন্মহার, মৃত্যুহারের সাহায্যে স্বাভাবিক পরিবর্তনের গতি নির্ধারণ করা যাবে। তার সঙ্গে নীট পরিযান যোগ করলে সময়ের প্রভাবকে অনেকটা ধরা যায়। এছাড়া পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট হার ধরে নিয়ে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা পরিমাপ করা যায়।

এইভাবে সময়ের যা মোকাবিলা করা হ'ল সেটি কতটা নির্ভরযোগ্য ? জনসংখ্যা পরিবর্তনের সবটাই কি এতে ধরা পড়ল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটি নির্ভর করে কতটা সাবধানতার সঙ্গে ভিত্তি জনসংখ্যার হিসাব নেওয়া হয়েছে ও সময়ের প্রভাবকে সঠিকভাবে পঞ্জীয়ন প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে কিনা। যেসব পরিবর্তনকারী তথ্যের উপর নির্ভর করে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয় সেগুলি কতটা যুক্তিসঙ্গত।

মোট জনসংখ্যার সাথে অন্তত দুটি বিষয়ে পরিবর্তনকে পৃথকভাবে জানবার প্রয়োজন থাকে। সে দুটি হ'ল বয়স বিশেষিত গঠন ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ। সাধারণত দুটির মধ্যে যেকোনও একটি উপায় অনুসরণ ক'রে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আদমসুমারী তথ্যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের যে হার সূচিত হয়েছে প্রত্যেক বয়স বিশেষিত শ্রেণীতে স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ওই হার প্রয়োগ ক'রে প্রত্যেক শ্রেণীতে মোট পরিবর্তন জানা সম্ভব। আবার আদমসুমারীর পরবর্তীকালে পরিবর্তনের হারের উপর ভিত্তি ক'রে নতুন জনসংখ্যা প্রক্ষেপিত হ'ল। এইবার আদমসুমারীর তথ্যে যে শ্রেণীর মধ্যে যতটা অংশ জনসংখ্যা দেখা গেছে সেই অনুপাতগুলিকে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার উপর প্রয়োগ ক'রে প্রতি শ্রেণীর সংখ্যা নির্দেশিত করা যায়। প্রক্ষেপের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জন্মহার ও মৃত্যুহারের গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা করা। প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার

পরিমাণ কিরকম হবে তা সম্পূর্ণ এই ধারণার উপর নির্ভরশীল। অতীতের অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে এই ধারণাগুলি গড়ে তোলা হয়।

5.2 প্রজনন সংক্রান্ত বিশেষ ধারণা-ভিত্তিক ধরন

জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করতে গেলে প্রথমত ভিত্তি বছরের তথ্যকে সুচিন্তিতভাবে সারিবদ্ধ করতে হবে। সাধারণত 5 বৎসরের ব্যাপ্তিতে এক একটি বয়স সারণি গঠন করা হয়। যেমন 10-14 বৎসর, 15-19 বৎসর ইত্যাদি। জনসংখ্যার গতি নির্ণয় করতে হলে প্রজনন তথ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদী প্রক্ষেপ করতে গেলে প্রজনন হার একই রকম আছে একথা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এখন সব দেশই প্রজননের গতিকে মন্দীভূত করতে পক্ষপাতী। সুতরাং প্রজনন কমে যাচ্ছে এরকম ধারণা করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। জনসংখ্যা প্রক্ষেপের সময় প্রজনন হার নিম্নাভিমুখী ব'লে ধরে নেওয়া হয়। প্রজনন কি হারে কমছে বা কমবে সেই ধারণা দেওয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা প্রক্ষেপের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের তথ্যই বেশী জরুরী। বয়স বিশেষিত প্রজনন হার তথ্য যতদূর সম্ভব নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্যভাবে গঠন করতে হবে। বিশেষ বিশেষ বয়ঃগোষ্ঠীতে প্রজনন হার হয়ত সার্বিক প্রজনন হারের থেকে পৃথক হ'তে পারে। বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর প্রজনন হার কিন্তু দীর্ঘসময়ে জনসংখ্যার গতিকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রজনন হারের উপর ভিত্তি ক'রেই সংজনন হার গড়ে উঠেছে।

আমরা দেখেছি যে সাধারণভাবে মনে করা হচ্ছে নীট সংজনন হার 1 হলে জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় আসবে। আবার নীট সংজনন হার বর্তমানে 2 হলে 27 বছর পরে জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বছর মোটামুটি 2.5% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে দেখা যায়। নীট সংজনন মোট সংজনন হারের উপর নির্ভরশীল। আবার মোট সংজনন সার্বিক প্রজনন তথা জন্মহারের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা প্রক্ষেপকালে নীট সংজনন কখন 1 হবে এই ধারণা খুবই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন গতিতে সার্বিক প্রজনন ও মোট সংজনন হার পরিবর্তিত হবে ধরে নিলে নীট সংজননে এই অবস্থায় পৌছাবার সময়কাল বিভিন্ন হতে পারে। কখন হয়ত 20 বছরে কখন হয়ত 30 বছরে এই অবস্থায় পৌছলে আর তা পরিবর্তিত হবে না মনে করে সাধারণত প্রক্ষেপ করা হয়। তবে নীট সংজনন 1 এর থেকেও কমে যেতে পারে। সে অবস্থায় জনসংখ্যা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাও হ্রাস পেতে পারে। সাধারণত বর্ধনশীল জনসংখ্যার থেকে শুরু করা হয় ব'লে নীট সংজনন 1 এর নীচে যাওয়া পর্যন্ত প্রক্ষেপ প্রসারিত করা হয় না।

জনসংখ্যা প্রক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রজনন হারের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে নানারকম

ধারণা করা যায়। (1) প্রজনন হার প্রক্ষেপণকালে পরিবর্তিত হবে না। (2) প্রজনন হার নির্দিষ্ট গতিতে পরিবর্তিত হবে। (3) ওই হার বিভিন্ন গতিতে পরিবর্তিত হবে। স্বভাবতই বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পরিমাপও বিভিন্ন রকমের হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনের ধারণা করেই জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ প্রজননের হারে নির্দিষ্ট গতিতে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ক্রমশ নীট সংজনন হার 1 এর কাছে এসে পৌছে যাবে।

এইভাবে ধারণা গঠন করার দুটি কারণ আছে। প্রথমত উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ। জন্মহার বেশ কম। আবার উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বাড়লেও দূর ভবিষ্যতে খুব বেশী হারে বাড়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেছে এবং স্থিতিশীল জনসংখ্যা পৌছানোর আশা পোষণ করে। এদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পর নীট সংজনন হার 1 হবে এই ভেবে জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করার প্রথা বাস্তবানুগ। আবার নীট সংজনন 1 এর থেকে হ্রাস পাবে এরকম ধারণা উন্নত দেশে করার সম্ভাবনা থাকলেও তা করা হয় না। কারণ জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পেতে শুরু করলে রাষ্ট্র ও সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। তখন জন্মহার বৃদ্ধি করতে উৎসাহদান করা হয়। সুতরাং নীট সংজনন 1 এর নীচে যাবে এটা কোনও দেশের কাম্য নয়। ফলে ওই ভিত্তিতে কোনও রকম প্রক্ষেপ করার তেমন রেওয়াজ নেই।

মরণশীলতা সংক্রান্ত বিশেষ ধারণা-ভিত্তিক ধরন :

মরণশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে মৃত্যুহার ক্রমশ কমে যাবে। প্রথমদিকে মৃত্যুহার দ্রুত হারে নামবে। তার পরবর্তীকালে 10, 15, 20, 25 বছরের মধ্যে এই হ্রাসের হার ক্রমশ কমে আসবে। অর্থাৎ মৃত্যুহার বেশ কমে গেলে তারপর আর দ্রুতবেগে কমবে না। অনুন্নত দেশে গোড়ার দিকে মৃত্যুহার বেশী থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রের এখন প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং চিকিৎসা বিদ্যার ফলাফল এখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধ, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা এখন আর অজানা নয়। তাই মৃত্যুহার শুরুতে বেশী থাকলে জনসংখ্যা প্রক্ষেপের সময় দ্রুতহারে তা কমবে এই ধারণা করে নেওয়াই বিধেয়।

জীবন সারণি মরণশীলতার তথ্য দিয়ে থাকে। মরণশীলতার স্তর কি তা জীবন সারণিতে উপস্থাপিত প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য শুরুতে বয়স বিশেষিত জীবনকালের তালিকা গঠন করা হয়। যেহেতু

প্রজননে স্ত্রীলোকের ভূমিকা মুখ্য স্ত্রীলোকের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল এখানে বেশী প্রয়োজনীয়।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বিভিন্ন দেশে স্ত্রীলোকদের গড়পড়তা প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল 77·5 বছর বয়সের বেশী হবে না। বিংশ শতাব্দীতেই সর্বত্র মৃত্যুর প্রকোপ কমে আসবে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রবণতা পরবর্তী শতাব্দীতেও প্রসারিত হবে, বিশেষ করে যেসব দেশে মৃত্যুহার বিংশ শতাব্দীতেও তুলনামূলকভাবে উঁচু স্তরে থাকবে সেখানে ভবিষ্যতে মৃত্যুহার হ্রাস পাবার সম্ভাবনা আরও বেশী হবে। পৃথিবীব্যাপী স্ত্রীলোকের গড়পড়তা প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল অদূর ভবিষ্যতে 75 বৎসর হবে আশা করা যাচ্ছে। তার মধ্যে উন্নত দেশে এই হার 77.5 বৎসর ও উন্নয়নশীল দেশে 74 বৎসর হবার সম্ভাবনা। অবশ্য এই স্তরে পৌছাতে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়।

জন্মহার নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এই হারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তর, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই জন্মহার সম্পর্কে নানারকম সামাজিক নীতি নিয়ম চালু করেও হয়ত আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য জন্মহারের গতি সম্বন্ধে যা ধারণা করা হয় অনেক সময় বাস্তব ক্ষেত্রে তার থেকে জন্মহার অনেক বিভিন্ন হয়। মৃত্যুহার সম্বন্ধে ধারণা সে তুলনায় অনেক বাস্তবানুগ। এর একটি কারণ মরণশীলতার প্রবণতা দ্রুত পরিবর্তনশীল নয় অথবা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সঙ্গেও এর সম্পর্ক নেই। যুদ্ধ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এরকম কয়েকটি কারণে হয়ত একসাথে অনেক মানুষের মৃত্যু হ'ল। কিন্তু এগুলি স্বাভাবিক ঘটনা নয়। সাধারণভাবে মৃত্যুহার বয়স ও পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল। পারি-পার্শ্বিক অবস্থা সুসঙ্গত হ'লে মানুষের সুস্থ শরীরে বেশীদিন জীবিত থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। অবশ্য জীববিদ্যার নিয়মানুসারে ক্রমশ বয়সের সাথে শরীরে ক্ষয় হয় ও জীবনী-শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

পরিবেশকে উন্নত করে মৃত্যুহার কমিয়ে ফেলতে পারলে সে অবস্থা বহুদিন অপরিবর্তিত থাকে। এখন মৃত্যুহার কমলে ভবিষ্যতে জন্মহারকে কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জন্মহার ও মৃত্যুহার একই সাথে কমলে ক্রমশ উর্ধ্ব বয়স শ্রেণীতে জনসংখ্যার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাবে। ফলে বয়সের প্রভাবে সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত মৃত্যুহার কিছু বৃদ্ধি পাবে। স্বল্পমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপে মৃত্যুহার যদি অপেক্ষাকৃত নীচুস্তর থেকে সুরু করা হয় তবে পরবর্তীকালে তা মোটামুটি স্থায়ী

থাকবে এই ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য মরণশীলতার পরিবর্তনশীল হার যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় তা বলা হচ্ছে না। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচ্য।

5.4 জনসংখ্যা প্রক্ষেপের সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ কথা—

সাধারণভাবে জনসংখ্যা তত্ত্বের বিভিন্ন নির্দেশকের মধ্যে সম্পর্ক খুব সহজভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। জন্মহার বিভিন্ন স্তরের হলে জনসংখ্যা কেমন হবে তা কিছুটা বোঝা যায়। আবার নির্দিষ্ট সময়ের পর জনসংখ্যাকে একটা নির্ধারিত স্তরে নেবার জন্য জন্মহার কিরকম হওয়া উচিত তাও পরিমাপ করা সম্ভব। জনসংখ্যা প্রক্ষেপ করতে হলে কতকগুলি মূল তথ্যের উপর জোর দিতে হবে। যেমন প্রজননের স্তর ও জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠন—বিশেষ করে প্রজননক্ষম স্ত্রীলোকদের বয়স বিশেষিত গঠন সঠিকভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। তারপর আসছে মরণশীলতার প্রবণতা। এই প্রবণতা বিভিন্ন বয়সের মানুষের উপর কিরকম প্রভাব সৃষ্টি করবে সেটিও পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ করতে হবে। আরও কিছু তথ্য যেমন বিবাহিত নারীর সংখ্যা বিবাহের গড়পড়তা বয়স, স্ত্রীলোকের বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির তথ্যও জনসংখ্যা প্রক্ষেপের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কারণ জন্মহার এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জনসংখ্যার প্রক্ষেপিত পরিমাপ নানা প্রয়োজনে আসে। প্রথমত ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মানকে একইরকম রাখতে গেলে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার জন্য কি পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। আবার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হলে কি হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার তাও প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করা যায়। তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানুসারে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা যেতে পারে সেই ধারণার উপর ভবিষ্যৎ উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হয়। মোট উৎপাদন বা আয় কি পরিমাণ জনসংখ্যাকে উপযুক্তভাবে জীবন ধারণে সক্ষম করবে তার উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি, জন্মহার হ্রাস করার ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রজনন ও মরণশীলতার বিভিন্ন নির্দেশকের গতিপথ নির্ধারিত করে জনসংখ্যার যে প্রক্ষেপ করা হয় সেটি ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাজকর্ম কিভাবে চলবে তার দিক নির্দেশে সহায়তা করে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটবে। তাই দূরদর্শী মানুষ জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল করতে আগ্রহী। স্থিতিশীলতার জন্য নীট সংজনন হারকে 1 বা তার কাছাকাছি মানে স্থিতিশীল হতে হবে সেজন্য মোট বয়স বিশেষিত জন্মহারকে কতটা কমাতে

হবে এবং বর্তমান অবস্থায় কখন তা সম্ভবপর এগুলিও জনসংখ্যা প্রক্ষেপে কার্যপ্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

5·5 ভারতে জনসংখ্যা প্রক্ষেপের প্রচেষ্টা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জনসংখ্যার পরিমাপের গুরুত্ব যথেষ্ট তা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি। ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য নির্ভরযোগ্য জনসংখ্যা পরিমাপ গড়ে তুলতে পরিকল্পনা কমিশন 1958 সন থেকে বিভিন্ন এক্সপার্ট কমিটি নিয়োগ করে চলেছেন। এরা আদমসুমারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য ও জীবন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন জন্ম, মৃত্যু সংক্রান্ত অনুপাতের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করেছেন।

আধুনিককালে 1971 ও 1981 তে এই ধরনের প্রক্ষেপের চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। 1971 সনে প্রথম একটি কমিটি গঠিত হয়। তখনও 1971 সনে আদমসুমারীর মূল প্রতিবেদন (**Final Report**) প্রকাশিত হয়নি। এই কমিটি 1964 তে প্রক্ষেপের যা হিসাব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা করে প্রজনন ও মরণশীলতা সম্পর্কে নতুন ধারণার ভিত্তিতে ওই হিসাবের সম্ভাব্য পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। 1971 এর প্রতিবেদন বের হবার পর 1974 সনে নতুন একটি কমিটি গঠিত হয়। 1979তে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্য নিয়ে কাজ করার সুবিধা পান। ফলে এদের কাজের পরিধি আরও ব্যাপক হয়। এই কমিটি উপাদানগত পদ্ধতিতে ভারতের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার পরিমাপের একটি তালিকা দেন। সেটি পুরাতন তালিকার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে। সর্বভারতীয় পরিমাপ ছাড়াও 15টি রাজ্যের সম্পর্কে পৃথক পরিমাপ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি পরিমাপের বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জনসংখ্যার গঠনও উপস্থাপিত করা হয়। এছাড়া সর্বভারতীয় ও রাজ্যের ক্ষেত্রে গ্রামবাসী ও শহরবাসীর পরিমাপ পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। 1971-1991 এর মধ্যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই পরিমাপগুলি উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রজনন ও মরণশীলতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ক'রে নিয়ে এই পরিমাপগুলি গঠিত হয়েছে। প্রজনন সম্পর্কে তিনটি ধারণার উল্লেখ আছে। প্রথম ধারণা 1984র মধ্যে জন্মহার হাজারে 25 হবে, তার পরবর্তীকালে বছরে এক পয়েণ্ট কমবে। দ্বিতীয় ধারণা 1975 সন অবধি পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলের মধ্যে অনুপাত গ্রহণ ক'রে সেই অনুপাত প্রক্ষিপ্ত ক'রে জন্মহারের গতি নির্ধারণ। তৃতীয় ধারণা জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় তারই উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত। এক্ষেত্রে মনে করা

হয়েছে 1982-83 পর্যন্ত জন্মহার হাজারে 30 এর নীচে নামবে না। এর পরে জন্মহার কমান কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খুব কমহারে জন্মহার কমবে অর্থাৎ 2 বছরে 1 পয়েণ্ট মতন। এই তিন ধরনের ধারণা অনুসারে পাঁচ বছরব্যাপী সময়ের জন্মহার বিভিন্ন হয়েছে। প্রথম ধারণার উপর গঠিত জন্মহার সবচেয়ে কম, দ্বিতীয় ধারণায় তার চেয়ে কিছু বেশী, তৃতীয় ধারণা অনুসারে যে জন্মহারের পরিমাপ করা হয় তা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশী।

মরণশীলতা সম্পর্কে একইরকম ধারণা করা হয়েছে। 1961-70 সনের জীবন সারণি থেকে সুরু ক'রে গড় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি যে হারে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে 2001 সনে স্ত্রী-পুরুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পার্থক্য দূর হয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে 64 বৎসর হবে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে মরণশীলতার কোলে ডেমনি প্রদত্ত 'পশ্চিম' মডেল জীবন সারণি থেকে নেওয়া হয়েছে।

এইভাবে 1971 সন থেকে 5 বছর অন্তর 'প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও তার স্ত্রী-পুরুষ ভেদের পরিমাপ নিচে দেওয়া হ'ল।

সারণি 5 : 1

জনসংখ্যার প্রক্ষিপ্ত হিসাব[2] (তৃতীয় ধারণার ভিত্তিতে)

বর্ষ	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
1971	5471370	2835030	2636340
1976	6090940	3154270	2936670
1981	6720140	3476320	3243820
1986	7350940	3798330	3552610
1991	7989580	4124360	3865220

মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে তার পরিমাপ করা হয়েছে। গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের 1901 থেকে 1971 পর্যন্ত প্রত্যেক আদমসুমারীর ফলাফল বিচার ক'রে দেখান হয়েছে যে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে সব সময়ে বেশী রয়েছে। নানাকারণে শহরে বসতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম থেকে চলে এসে লোকে শহরে বসবাস করছে। আবার অনেক জায়গায় কিছু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন শহর গড়ে উঠেছে।

শহর ও গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পার্থক্য নিয়ে শহরের জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়েছে। এই পার্থক্যের হার বাড়ছে, কমছে ও স্থির থাকছে এই তিন ধরনের

ধারণা ক'রে নিয়ে তিন ধরনের পরিমাপ দেখান হয়েছে। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন হ'লে অনেকে মনে করেন শহরবাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। আবার গ্রামীণ উন্নয়ন দ্রুতহারে হ'লে ও গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে লোকে গ্রামের অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ ছেড়ে শহরে ভিড় না জমাতে পারে। কেবল গাণিতিক ফর্মুলার সাহায্যে জনসংখ্যা প্রক্ষেপ করলেই সঠিক ফল পাওয়া যাবে না। জনসংখ্যা প্রক্ষেপ পরিবর্তনের পেছনে কি কি বিষয় কাজ করছে তা অনুধাবন ক'রে বিভিন্ন ধারণায় আসতে হবে।

গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষ শ্রেণী বিভাগও দেওয়া হয়েছে। প্রথমে গ্রামবাসীর উপর মোট জনসংখ্যার পুরুষের অনুপাত প্রয়োগ ক'রে গ্রামনিবাসী পুরুষের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। তারপর মোট সংখ্যাগুলি থেকে বাদ দিয়ে ক্রমান্বয়ে গ্রামের স্ত্রীলোক, শহরবাসী স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। আবার 1971 সনের বয়স বিশেষিত জনসংখ্যাকে 5 × 2 ম্যাট্রিকসে (Matric) সাজিয়ে প্রতি শ্রেণীতে পরবর্তী 4টি নির্দিষ্ট বছরের জন্য জনসংখ্যার পরিমাপ করা হয়েছে। এইভাবে 1971 এর আদমসুমারী তথ্যের উপর ভিত্তি করে 1991 পর্যন্ত পাঁচ বছর অন্তর মোট জনসংখ্যা ও তার কতগুলি শ্রেণী বিভাগের পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে।

1981 সনের আদমসুমারীর পরও মুখ্য পঞ্জীয়ন দপ্তর[3] জনসংখ্যা প্রক্ষেপের এক প্রতিবেদন রচনা করিয়েছেন। এই প্রতিবেদন কি কি ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন রীতি প্রয়োগ ক'রে জনসংখ্যার প্রক্ষেপ করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট আলোচনা আছে। মোট তিন ধরনের পরিমাপ প্রক্ষেপিত হয়েছে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। তিনটি প্রক্ষেপের ক্ষেত্রেই মরণশীলতা সম্পর্কে একইরকম ধারণা করা হয়েছে। ধারণাটি 1971-র প্রতিবেদনের অনুরূপ।

অর্থাৎ জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল প্রতি বছর 6 মাস করে একইভাবে বৃদ্ধি পাবে। শুধু মডেল জীবন সারণির পরিবর্তে নমুনা পঞ্জীয়ন প্রথার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে তোলা জীবন সারণির তথ্য নতুন প্রক্ষেপের সময় গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রজনন সম্পর্কিত ধারণা অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এক থাকেনি। বিভিন্ন পরিমাপের জন্য সাধারণ প্রজনন হার বিভিন্ন রূপে ধার্য করা হয়েছে। এই হার দুটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 15-44 বৎসরের নারীদের বিবাহের হার আর বিবাহিত নারীদের মধ্যে প্রজনন হার। যে সময় সীমার মধ্যে জনসংখ্যা প্রক্ষেপিত হয়েছে তাতে বিভিন্ন বয়স শ্রেণীতে বিবাহের হার একইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ব'লে ধরা হয়েছে। কিন্তু বিবাহিত দম্পতি কি হারে জন্মশাসনের সুযোগ নিয়েছে তার গতি তিন ধরনের প্রক্ষেপের ক্ষেত্রে

বিভিন্ন। বিবাহিতদের ভিতর প্রজনন হার এই জন্মশাসন পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উচ্চ পরিমাপে প্রজননক্ষম সুরক্ষিত দম্পতির হার শতকরা 28 জন থাকবে বলে ধারণা করা হয়েছে। 1983-84 সন থেকে এই স্তর বলবৎ হবে। নিম্ন পরিমাপে ধারণা করা হয়েছে যে এই হার 2000 সন পর্যন্ত বাৎসরিক 2% হারে প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকবে। তাহ'লে 15-44 বছর বয়সের প্রজননক্ষম দম্পতির শতকরা 60 ভাগ ওই সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত হবে। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছান আর নীট সংজনন হার এক হওয়া একই কথা। মধ্য পরিমাপে প্রতি বছর সুরক্ষণের হার 1·3% ক'রে বাড়বে ধারণা করা হয়েছে। 1981 র জনসংখ্যা 68·5 কোটিতে ভিত্তি ক'রে 2001 সনে তিন ধরনের প্রক্ষেপের ফলে যথাক্রমে মোট জনসংখ্যা 105·2 কোটি 99·1 কোটি ও 95·9 কোটি হতে পারে হিসাব করা হয়েছে। নিম্ন পরিমাপেও দেখা যাচ্ছে 1981-1991 এর দশকে জনসংখ্যা প্রতি বছর 1·5 কোটি ক'রে বাড়ছে দেখা যাচ্ছে। পরের দশকে বৃদ্ধির পরিমাণ কমে গিয়ে 1 কোটি হয়েছে।

জনসংখ্যার বয়স বিশেষিত গঠনকেও পরিমাপ করা হয়েছে। 1981র প্রতিবেদনে প্রজননক্ষম দম্পতির মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 15 থেকে 44 বৎসরের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহের হারও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

1981 সনে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহিতের হার শতকরা 80·48 দেখা যায়। 1971 সন থেকে শতকরা 3·42 ভাগ হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই হ্রাসের হার বিভিন্নরূপ। তেমনি প্রজননক্ষম দম্পতিদের সুরক্ষিত হবার হারও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নরূপ।

1981 র প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার তথ্য সপ্তম পরিকল্পনায় প্রয়োজনে আসবে। অবশ্য অতীতে আমরা দেখেছি যে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার সঙ্গে প্রকৃত জনসংখ্যার তফাত থাকে। যেমন বিভিন্ন সূত্র থেকে 1961 র প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা যা পাওয়া যায় তা আদমসুমারী প্রদত্ত জনসংখ্যা থেকে অনেক কম। তবুও জনসংখ্যার প্রক্ষেপিত পরিমাপ না থাকলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণাই করা সম্ভব হত না।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য Statistical Abstract (1976 & 77 Combined) Bureau of Applied Economics, and Statistics, Govt. of W. Bengal.

2 দ্রষ্টব্য Population Projections 1981-2001. An appraisal and an alternative_K. Sundaram, Economic & Political Weekly Vol xix. No. 34, 25th August 1984.

3. দ্রষ্টব্য Registrar General and Census Commissioner, Govt. of India Population Projections for India, 1981-2001 Paper 1 of 1984.

ষষ্ঠ অধ্যায়

জনসংখ্যা নীতি

6·1 জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা

জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনায় অনেকেই এর গতিপ্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপের দ্বারা পরিমাণগতভাবে জনসংখ্যার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এখন এই প্রক্ষেপ কতকগুলি ধারণার উপর নির্ভর ক'রে গড়ে ওঠে যার পিছনে কিছু তাত্ত্বিক মতবাদ কাজ করে থাকে। ইউরোপীয় দেশে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ক'রে টমাস রবার্ট ম্যালথাস একটি জনসংখ্যা তত্ত্ব রচনা করেন।

ম্যালথাস দুটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর তত্ত্বকে গড়ে তুলেছেন। এক, মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। দুই, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণ অপরিহার্য এবং তা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকবে। ম্যালথাসের মতে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি না করলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়বে। কিন্তু জমির উর্বরতা সীমাবদ্ধ, সুতরাং খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারেই বাড়তে পারে। ফলে ক্রমশই জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের ব্যবধান বেড়ে চলবে। দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দুঃখ-দুর্দশা বাড়তে থাকবে ও জনসংখ্যা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তাই প্রকৃতিতে কিছুটা ভারসাম্য আনার জন্য দুর্ভিক্ষ, মহামারী ঘটে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। এই ইতিবাচক পন্থার উপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছেন।

ম্যালথাস জন্ম প্রতিরোধের কথা কিছু বলেছিলেন। তাঁর সময় জন্মশাসন সামান্য দেখা দিয়েছিল। তিনি বেশী বয়সে বিবাহ, বিবাহিত জীবনে সংযম ইত্যাদির পরামর্শ দিলেও এ সম্পর্কে বিশেষ ভরসা রাখতে পারেননি। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এই পথে চলতে পারে।

শিক্ষার প্রসার তখন তেমন ঘটেনি। মোটামুটিভাবে ম্যালথাস মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা নৈরাশ্যজনক চিত্র দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সারাজীবন ধরেই জনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময় বিভিন্ন দেশের উপযুক্ত তথ্য ছিল না। তবুও অনলস পরিশ্রমে তিনি নানা দেশের তথ্য আহরণ করে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। যদিও ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দেশে প্রযোজ্য হয়নি। তাঁর মতবাদ জনসংখ্যা তাত্ত্বিক আলোচনার একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জন্মশাসন বহুল পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় 'জ্যামিতিক হারে জন্মবৃদ্ধি' ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বরং ওই দেশগুলিতে জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে অনেকক্ষেত্রে জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধেও ম্যালথাসের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে খাদ্য উৎপাদন ও আরও বিভিন্ন বিষয়ে উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আরও বহুবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বৃদ্ধি পাওয়া – খাদ্য ও মৈথুন এই দুটি বিষয়েই মানুষের পূর্ব আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ম্যালথাসের মতবাদকে এত সহজে বাতিল করা সম্ভব নয়।

মানুষের সমাজে দারিদ্র্যের কারণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই ম্যালথাসের এই মতবাদ গড়ে উঠেছে। একদিক থেকে তিনি একটি শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরেছেন। জনসংখ্যাকে কিছুতেই বিনা বাধায় বাড়তে দেওয়া চলে না। জনসংখ্যা ও জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলেই প্রকৃতি দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মহামারী, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জনসংখ্যা কমিয়ে দেবে এবং ভারসাম্য পুনপ্রতিষ্ঠিত করবে। কিভাবে জনসংখ্যা বা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে সেটি ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে ম্যালথাসের মতবাদের মধ্যে বেশ কিছু বাস্তব সত্য নিহিত রয়েছে দেখা যায়।

বিজ্ঞানের পরবর্তী কার্যক্রম ম্যালথাসের জানা না থাকলেও তিনি কিন্তু সামাজিক গতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তৎকালে প্রচলিত প্রগতির ক্রমবিবর্তনবিষয়কে আক্রমণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গুডউইন প্রমুখ এই মতবাদের প্রবক্তারা মানুষের স্বাভাবিক সহৃদয়তা সুবুদ্ধির উপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু ম্যালথাসের মতে এগুলি সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের চাপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে সম্পত্তির মালিকানা, পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থানের চিন্তা মানুষের স্বভাব চরিত্রে অসংগতি এনে দেয় তাকে

হীনতার দিকে টেনে আনে। প্রাচুর্য থাকার সময় শিশুর জন্ম আনন্দের বিষয়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তথাকথিত প্রাচুর্য হ্রাস পাবে। তখনই আসবে দলাদলি, অশান্তি।

ম্যালথাসের অর্থনৈতিক মতবাদ বিশেষ ক'রে তাঁর 'দরিদ্র আইনের' বিরোধিতার জন্যও তাঁকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কৃষি ও শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। এটি তাঁর জনসংখ্যার গতি সম্পর্কে ধারণার সঙ্গেও জড়িত। অ্যাডাম স্মিথ মূলধন সংগঠন ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ম্যালথাসও স্বীকার করেন যে মূলধন তথা আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীর কিছু সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সম্পদ বাড়ছে অথচ জনসাধারণ কোনই সুখ-সুবিধা পাচ্ছে না এই ধরনের অবস্থার কথা স্মিথ একদমই উল্লেখ করেননি এটাই ম্যালথাসের অভিযোগ। তাঁর মতে শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি থেকে শিল্পের দিকে বিনিয়োগ ও আয় বাড়বে। কৃষি পিছিয়ে পড়বে এবং খাদ্য সমস্যা আরও প্রকট হবে। ম্যালথাসের অবশ্য কৃষির উপর বেশী পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্তু শিল্পোন্নতির প্রথম যুগেই তিনি কৃষি ও শিল্পের আয়ের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ম্যালথাসের মতবাদ যথেষ্ট পরিমাণে গতিশীল ও তথ্যভিত্তিক ছিল ব'লেই পরবর্তীকালের কোনও তাত্ত্বিকই তাঁর আলোচনা বাদ দিয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেননি। কেনেথ ই. হোল্ডিং[1] ম্যালথাসের বিশ্লেষণের প্রশংসা করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পল, এরিক[2] ম্যালথাসের গোঁড়া সমর্থক। যদিও তাঁর আলোচনায় অনেক আধুনিক পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত আধুনিক যুগে জনসংখ্যা তাত্ত্বিকদের ম্যালথুসীয়, নব্য ম্যালথুসীয় ও ম্যালথাস বিরোধী এই তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যেই ফেলার চেষ্টা করা হয়।

ম্যালথাসের মতবাদের বিপরীতমুখী হ'ল মার্ক্সীয় চিন্তাধারা। যদিও মার্কস জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে কখনও আলোচনা করেননি। তাঁর ও এঞ্জেল্‌সের লেখায় জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ম্যালথাস জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রকৃতির অমোঘ নিদানকেই একমাত্র গ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা সর্বদাই চেষ্টা ক'রে মানবজীবনে পরিবর্তন আনায় বিশ্বাসী। সুতরাং ম্যালথাসের স্বাভাবিক বিবর্তনকে এঁরা মেনে নিতে পারেননি। ম্যালথাসের 'দরিদ্র আইন' বিরোধিতাকে এঁরা সুচক্ষে দেখেননি। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক জীবন পরস্পর বিজড়িত এবং এর মধ্যে জনসংখ্যাকেই জীবনের নিয়ামক হিসাবে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরপক্ষে মার্কস মনে করতেন সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত

বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে জনগণের জীবনের এবং সামাজিক গতিপ্রকৃতির নিয়ামক।

মার্কসের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমাজের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশীল লোক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষপাতী। কারণ অধিক জনসংখ্যার ফল অধিক শ্রমিক ও 'অতিরিক্ত মূল্য' (surplus value) সৃষ্টির সুবিধা। তাঁর মতে শ্রমের কম মূল্যায়ন বা নিম্ন মজুরী হার অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি। তিনি মনে করতেন যে প্রকৃতির ব্যবস্থা এমনই যে অবাঞ্ছিত জনসৃষ্টি সম্ভব নয়। স্বার্থান্বেষীরা জনসংখ্যার ভারসাম্যের অভাব ঘটায়। গ্রামের কৃষিক্ষেত্র থেকে মানুষকে টেনে এনে শহরের শিল্পক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির কাজে লাগায়। দেখা যাচ্ছে মার্কসের কৃষি-শিল্প সম্পর্কের ধারণাও প্রাচীনপন্থী। ধনতান্ত্রিক শোষণই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম এ বিষয়ে খাটে না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তিত ক'রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে এটাই মার্কসের বিশ্বাস ছিল। শোষণমুক্ত সমাজে অতিরিক্ত শ্রমের যোগান থাকবে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হ'লে জন্মহার, মৃত্যুহার হ্রাস পাবে। কারণ নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় শিশু শ্রমিক থাকবে না বরং শিশুকে মানুষ করা ব্যয়সাপেক্ষ হবে। লোকে তাই পরিবার বৃদ্ধিতে উৎসাহী হবে না। আধুনিক যুগেও কিন্তু এই ধরনের মতামত দেখা যায়।

মার্কস ও ম্যালথাস জনসংখ্যা সমস্যাকে দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁদের মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের আলোচনায় অনেক বিষয় রয়েছে যা আজকের পৃথিবীতেও প্রযোজ্য। কিন্তু জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারণে উভয়েই ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কস মনে করতেন সাম্যবাদ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ক'রে সমাজতন্ত্রী দেশে জনসংখ্যা হ্রাস করতে সক্ষম হবে। ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক শোষণ সামাজিক অশান্তির কারণ হবে। কার্যত ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পেয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত হ'ল। অবশ্য শিল্পকেন্দ্রিক দেশগুলিতে সময় সময় কিছু বেকার সমস্যা দেখা দিলেও শ্রমিক সংগঠন ও রাষ্ট্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব যেভাবে নিচ্ছে মার্কস তা কল্পনা করেননি। শ্রমিকরা এখন সমাজের শোষিত শ্রেণী নয়।

মার্কসের তাত্ত্বিক বিশ্বাস ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে ত্রুটিযুক্ত করেছিল। ম্যালথাস কেবলমাত্র জনসংখ্যা আলোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখায় মূল ব্যাপারটিতে অনেক পরিষ্কার ছিলেন। জনসংখ্যার সমস্যা তাঁর কাছে জনসমষ্টি

ও দেশের সম্পদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবের সমস্যা। অবশ্য তিনি এই সমস্যাকে বর্তমান পারিপার্শ্বিকের ভারসাম্যের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে দেখতে পারেননি। তবে তিনি এটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে একটা সীমার পর প্রকৃতি আর জনসংখ্যার ভার বহনে সমর্থ হবে না। মার্কস এই ভারসাম্যের অভাবের দিকে একেবারেই নজর দেননি।

উৎপাদন বৃদ্ধি না ক'রে শুধু বন্টন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েই সব সামাজিক অসংগতি দূর করা যায় না—পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও জনসংখ্যা নীতি গ্রহণে কিছুটা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। মার্কস ও ম্যালথাসের পরবর্তী যুগে একটি দেশের সম্পদ অনুসারে কাম্য জনসংখ্যা কি হতে পারে এ নিয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আলোচনা করেছেন।

বর্তমান যুগে কোন জনসংখ্যা তাত্ত্বিক মাত্রেই সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার সাযুজ্য আনার পক্ষপাতী ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে আগ্রহী। মানুষ দীর্ঘায়ু হয়ে সুস্থ শরীরে কর্মক্ষম অবস্থায় পৃথিবী উপভোগ করুক এটাই কাম্য। নীতিগতভাবে কি ধনতান্ত্রিক কি সমাজতান্ত্রিক সব দেশেই জন্ম, মৃত্যুহার আয়ত্বের মধ্যে এনে জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল করার পক্ষপাতী। কিন্তু যেহেতু জনসংখ্যার গতি প্রধানত জৈবিক কারণের উপর নির্ভরশীল নির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগে সবসময় ফললাভ আশানুরূপ হয় না।

6.2 জাতীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

ম্যালথাস এবং মার্কস উভয়েই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার বিচারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ম্যালথাস উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনায় ভাবিত ছিলেন। আর মার্কস উন্নয়নের ফলটি কোন শ্রেণী বিশেষ ভোগ করবে এই আশংকার নির্দেশ করেছেন। তাঁদের যুগ থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। সম্পদ জনগণের জন্যই এবং সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার না ঘটলে বহু সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে এ বিষয়ে আমরা অনেকেই সচেতন। বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি আলোচনা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে জনসংখ্যার গতি ও গঠনের বাস্তব চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই রচনা করা হয়েছে। মোটকথা জনসংখ্যার সমস্যা এতই বাস্তব ও বহুমুখী যে একটি নির্দিষ্ট গতানুগতিক নীতিতে তাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে যথোপযুক্ত নীতি অবলম্বন করে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিধিসঙ্গত পরিমাপ মাথাপিছু আয়, যদিও একে অতি

নির্ভরযোগ্য পরিমাপ বলা যায় না কারণ মাথাপিছু আয় থেকে বণ্টন সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায় না। যাই হোক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির অর্থ মোট আয় যে হারে বাড়ছে জনসংখ্যা তার চেয়ে কম হারে বাড়ছে। যদি বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্যও থাকে ভবিষ্যৎ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এক্ষেত্রে সম্ভব। ইউরোপীয় দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত-ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয়নি। সেখানে উন্নয়নের প্রথম স্তরে বণ্টনের অসমতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা সবই দেখা গেছিল। ক্রমে ক্রমে উচ্চতর জীবনযাত্রার মানে আকৃষ্ট হয়ে সাধারণের মধ্যে পরিবার সীমিত করে স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার ঝোঁক দেখা গেছে। এইসব প্রবণতা আবার নতুন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে তীব্রতর করেছে।

আমেরিকায় প্রধানত ইউরোপের নানা দেশের মানুষ পরিযান করে নিয়ে বসতি স্থাপন করল। প্রথমদিকে এখানে জীবনসংগ্রাম প্রবল ছিল। ক্রমশ পূর্ব উপকূলে লোকের ভিড় বেশী হতে থাকায় লোকে পশ্চিমদিকে বসতি স্থাপনে আগ্রহী হল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে সুরু করল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সম্পদ সৃষ্টির কাজ দ্রুততর হল। ফলে এখন এদেশে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশগুলির মুখ্য স্থানে রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেমনভাবে একসাথে চলেনি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তেমন গুরুতর মনে করার কারণ নেই। তবে বর্তমান পৃথিবীর ধারা অনুসারে এখানেও ব্যক্তিগতভাবে পরিবার বৃদ্ধির আগ্রহ কম। বাসস্থান এবং ভোগ্যদ্রব্যের ঘাটতি বোধহয় কিছুটা মানুষের বিবেচনাকে এ বিষয়ে প্রভাবান্বিত করেছে। সরকারীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার নীতি কিন্তু তেমন জোরদার নয়। আবার চীন বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থেকে হঠাৎ জন বিষ্ফোরণের (population explosion) সম্ভাবনায় ভীত হয়ে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে পরিবার সীমিত করার প্রথা কার্যকরী করছে ও তাতে উল্লেখযোগ্য ফললাভ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মতন ছোট দেশে যখন উন্নয়নের প্রভাবে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য কমে এল তখন অতিরিক্ত আয় যাতে বাড়তি জনসংখ্যার ভরণপোষণে ব্যয়িত না হয়ে যায় সেকথা ভেবে রাষ্ট্র সুষ্টুভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করল। সুতরাং উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার আয়তনের বিচার এক এক দেশে এক একরকমভাবে ঘটছে।

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করতে গেলে আমাদের আরও একটু বিশদ আলোচনায় যেতে হবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়। সব দেশে একই সময়ের মধ্যে একইভাবে এই ঘটনা ঘটেনি।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষ একদিকে সম্পদ সৃষ্টি করে ও অন্যদিকে সম্পদ ভোগ করে। সুতরাং সম্পদ সৃষ্টির কাজে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করে যদি জনসম্পদ নিয়োগ করা যায় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা তেমন নিদারুণ হবে না।

জীবনযাত্রার মান উন্নত হ'লে স্বাভাবিক নিয়মেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার কমে যাবে। বুখারেস্ট সম্মেলনে উন্নয়ন জন্ম নিরোধের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ব্যবস্থা ভারতের নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশগুলির এই শ্লোগান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে গেলে জনসংখ্যা সমস্যা গতিশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনাকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়ল। শিশু শ্রমিক গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যুক্তি গড়ে উঠল। শিশুদের মানুষ ক'রে তোলা ব্যয়সাপেক্ষ হ'ল। হয়ত রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব নিতে হ'ল। এইভাবে শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি দায়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াল। ভাল ক'রে ছেলেমেয়ে মানুষ করব এই আশা নিয়েই বাবা মা কম ছেলেমেয়ে জন্মাক এই সিদ্ধান্ত নিলেন। ক্রমশ যখন এই শিশুরা বড় হবে তখন তাদের বাবা মা বৃদ্ধ হবেন। উন্নয়নের ফলে মানুষের আয়ু এর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নতুন সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ভরণপোষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। সেখানেও হয়ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে যেমন নাকি অনেক পাশ্চাত্য দেশে আজকাল দেখা যাচ্ছে।

এখন ভারতের বর্তমান অবস্থার সামান্য আলোচনা ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। এদেশের পক্ষে এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক কথা যে 35 বছর ধরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হ'লেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বিশেষ কিছু উন্নত হয়নি। এর একটি প্রধান কারণ অবশ্যই বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি। আবার একই সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি সরকারীভাবে চালু হ'লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিরোধে তা অসমর্থ হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1961-71এর তুলনায়ও 1971-81 তে সামান্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সামান্য হারে বৃদ্ধির সংখ্যাগত পরিমাণ কিন্তু নগণ্য নয়। 1981র পরবর্তীকালে শোনা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মন্দীভূত হয়ে বাৎসরিক 2·5 থেকে 2·2 তে নেমে এসেছে। তবুও 1983 তে জন্মহার হাজারে 33·6 ও মৃত্যুহার হাজারে 11·90 দেখা যাচ্ছে।[3] মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে আবার বয়স্কদের মধ্যে যতটা আশাজনক ফল দেখা যাচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। এখনও শিশুমৃত্যুর হার 1000 এ 110 জন। 1961-71 ও 1971-81 র মধ্যে 5 বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা শতকরা 13 ভাগ হ্রাস পেয়েছে এবং 10 বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা শতকরা 10 ভাগ হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তীকালের জনসংখ্যা গঠন,

জনগোষ্ঠীর মধ্যে নির্ভরতার হার প্রভৃতি এর দ্বারা প্রভাবিত হবে সন্দেহ নেই।

পাশ্চাত্য দেশের 'স্থিতিশীল জনসংখ্যার' ধারণা ভারতের সরকার ও বিদগ্ধ শ্রেণীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে মনে হয়। প্রজনন ও মরণশীলতার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা গ্রহণ করে আগামী 20-30 বছরের মধ্যে জনসংখ্যা কি হ'তে পারে তার জন্য আলোচনা, গবেষণার অন্ত নেই। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর আগেই নীট সংজনন হারকে 1-এ এনে জনসংখ্যার স্থায়িত্ববিধান করা নাকি একান্তই জরুরী। এজন্য সরকারী মতে জন্মহার হাজারে 21 জন মৃত্যুহার হাজারে 9 জন হতে হবে। শিশু মৃত্যুহার হাজারে 60 জনে নামাতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নীতি রচিত হচ্ছে। ভারতের জনসংখ্যা নীতি সাধারণভাবে পরিবার সীমিতকরণ বা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে জন্মশাসন রীতির প্রবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ব'লে মনে হয়। চীন দেশ 1970 থেকে 1984 র মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শোনা যাচ্ছে বাৎসরিক 2·6 থেকে 1·5 এ নামিয়ে আনতে পেরেছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি এই দৃষ্টান্তকে খুব উল্লেখযোগ্য মনে করে। আমরাও এই উদাহরণে অনুপ্রাণিত। চীনের এক সন্তান পরিবারের ধারণা সাধারণভাবে কতটা গ্রহণযোগ্য এসব তলিয়ে দেখার সময় হয়নি। যাই হোক জনসংখ্যা নীতি এখনও আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির ভিন্ন আর বিশেষ কিছু নয়।

6·3 জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি—

সৃষ্টির প্রথম ধাপ বিবাহ, কারণ সামাজিক অনুশাসনের জন্য এখনও অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান উৎপাদন তুলনামূলক যথেষ্ট কমই হয়ে থাকে। বিবাহের বয়স স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিলে জন্মদানে সক্ষম অবস্থায় মৈথুনকাল হ্রাস পাবে ফলে জন্মহার কমবে। সেজন্য আইনের সাহায্যে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি বা একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতের উপর নির্ভর করে বিবাহ প্রথা গড়ে উঠে। যেখানে স্ত্রীরা সংখ্যায় কম সেখানে এক নারীর একাধিক স্বামী বা বিশেষ ক'রে বিধবা বিবাহের প্রচলন বেশী। আবার অপরক্ষেত্রে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী·গ্রহণ করে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় জন্মহার বেশী হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। বিবাহ সম্পর্কিত অনুশাসন জন্মহার নিয়ন্ত্রণের সর্বাপেক্ষা সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি ব'লে মনে হয়।

পরিবার সীমিতকরণ বলতে আমরা অবশ্য বিবাহিতদের ক্ষেত্রে জন্মশাসন পদ্ধতি

গ্রহণ বুঝি। সেটি সাধারণত তিনভাবে হ'তে পারে। প্রথমত বিবাহিত জীবন-যাপন কালে নানা পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে সম্পূর্ণ প্রজনন ক্ষমতাকে জন্ম স্থষ্টির কাজে না লাগান। দ্বিতীয়ত স্থানবিশেষে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করলে গর্ভপাত ঘটান। তৃতীয়ত প্রজনন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেওয়া। সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রথম পদ্ধতি বেশী গ্রহণযোগ্য কারণ তা নমনীয়। কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা হ্রাস যেখানেই ঘটেছে সেখানে অপর দুই পদ্ধতি বেশী কার্যকরী দেখা যাচ্ছে।

প্রথম পদ্ধতির নানাপ্রকার ভেদ আছে এবং স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই এইগুলি গ্রহণ করতে পারেন। কোনওরকম ঔষধপত্র ব্যবহার না করেও এ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব। যেমন সংযম পালন ও দিনগোণা পদ্ধতি।

প্রথমটি বাস্তব জীবনে তেমন সম্ভবপর না হ'লেও দ্বিতীয়টি চেষ্টা করলে গ্রহণ করা সম্ভব। এটি সংজননের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। যদিও এই পদ্ধতি সবসময় সার্থক নাও হতে পারে। তবে এই ধরনের পদ্ধতির অন্য কোনও অসুবিধা বা জৈবিক কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

সঙ্গমকালে বিভিন্ন আচ্ছাদন বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ক'রেও গর্ভসঞ্চার বন্ধ করা যায়। এগুলি নিয়মিত ও সঠিক ব্যবহার নিঃসন্দেহে দিনগোণা পদ্ধতির চেয়ে জন্মশাসনের ক্ষেত্রে বেশী নির্ভরযোগ্য। এদের ব্যবহারের ফলে অনভিপ্রেত সন্তান স্থষ্টি এড়ানো যায়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই পদ্ধতিগুলি গ্রহণ অনেক সময় বিরক্তিকর হয়ে ওঠে এবং অনেকক্ষেত্রেই কিছুদিন পর এগুলির সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর অনীহা দেখা দেয়। এগুলির জৈবিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও সঠিক কিছু বলা যায় না। অধুনা অতি সহজ পদ্ধতি জন্ম নিরোধক পিল সেবন। ঋতুচক্রের সঙ্গে সঠিক হিসাব রেখে এই পিল সেবন করতে হয়। 'পিল' উন্নত দেশগুলিতে খুব জনপ্রিয়। পিল সেবনের সময়ে সন্তান সম্ভাবনা ঘটে না। তবে 'পিল' বন্ধ করলে শোনা যায় খুব দ্রুত গর্ভসঞ্চার হয়। অধিক দিন পিল সেবন করলে অনেকসময় কতকগুলি কষ্টকর পার্শ্ব উপসর্গ দেখা যায়। বর্তমানকালে আবার দেখা যাচ্ছে অধিকদিন পিল সেবনকারী মহিলারা নানা দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হচ্ছেন। এই সমস্ত পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করতে পারলে তবেই জন্মশাসন সার্থক হতে পারে। দিনগোণা পদ্ধতি বাদে আর সবক্ষেত্রেই কিছু ব্যয় হয় যা উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষ অনেক সময় করতে চায় না।

অস্থায়ী জন্ম নিরোধের আরেকটি প্রণালী হ'ল জরায়ুর অন্তঃস্থিত জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা। এর মধ্যে বহুল প্রচারিত পদ্ধতি পলিথিন বা স্টেনলেস স্টীল তৈরী লুপ জরায়ুতে সংস্থাপন। 'লুপ' চিকিৎসকের সাহায্যে খুব সহজে স্থাপন করা যায়। আবার

প্রয়োজনবোধে অপসারণও করা যায়। কিন্তু লুপের ক্ষেত্রেও পার্শ্ব উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আবার অনেকক্ষেত্রে উপযুক্ত নানা উপসর্গগুলি দূর করা বা লুপ অপসারণ না করার ফলে মহিলারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন দেখা গেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এইসব কৃত্রিম জন্মশাসন পদ্ধতি জন্মনিরোধে যথেষ্ট সার্থক। 'পিল' বা লুপ ব্যবহারকারী মহিলাদের পরবর্তীকালে সন্তান প্রসব করলে সেই সন্তানের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতাও লক্ষ্য করা যায়নি। তার প্রত্যেকটি পদ্ধতিরই কিন্তু অসুবিধা আছে। যেকোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতেই – মানুষকে কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

গর্ভনিরোধের থেকে গর্ভনাশ আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া। গর্ভনাশের প্রধান অসুবিধা হ'ল সামাজিক দিক থেকে এর স্বীকৃতি কম। কারণ অনেকে গর্ভনাশকে জীবহত্যার সামিল মনে করেন। যাই হোক অনভিপ্রেত জন্মরোধে ভ্রূণ হত্যা বহুকাল থেকেই প্রচলিত। বর্তমানে অনেক দেশে গর্ভনিরোধ আইন পাস ক'রে এ প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে সে দেশে জন্মহারও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। জাপানে এই প্রথা আইনানুগ। সোভিয়েট রাশিয়াতে জন্মশাসন অপেক্ষা মহিলারা অনেকসময় গর্ভপাতের সাহায্যই বেশী নিয়ে থাকেন। রুমানিয়া এই প্রথার উপর প্রথমে নির্ভর করলেও বর্তমানে একে বেআইনী ঘোষণা করেছে। ভারতেও গর্ভমোচন আইন 1971 সনে পাশ করা হয়েছে। গর্ভমোচন অবশ্য উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির থেকে বেশী সময় ও ঝুঁকির ব্যাপার। যত বেশী দেরী হয়ে যাবে ততই ঝুঁকি বাড়ে। চিকিৎসকের সাহায্য না নিয়ে এ কাজ করলে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী থাকে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বন্ধ্যাকরণ ও নিবীর্জকরণএর ফলে নারী পুরুষ তাদের প্রজনন ক্ষমতা পুরোপুরি হারায়। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে অতি অল্প আয়াসে এই অস্ত্রোপচার করা যায়।

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এই অস্ত্রোপচার আরেকটু কঠিন। উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র, অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে অনেকে মনে করেন এটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। তবে অল্প বয়সে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের ফল শারীরিক, বিশেষ ক'রে মানসিক ক্ষতি কতটা হতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ক'রে দেখা হয়নি। সাধারণত কয়েকটি শিশু জন্মের পর এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। কারণ দুএকটি শিশুর জন্মের পরেই যদি প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, এবং শিশুদের যদি অল্প বয়সে মৃত্যু হয় তখন মা বাবার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি জীববিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক অর্থনীতিবিদ

নির্ধারণ করবেন এবং সংখ্যা ও ভোগ্য সম্পদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটছে কিনা বিচার করে দেখেন। জনসংখ্যার গতি কি, বিভিন্ন জন্মহার মৃত্যুহার, সংজনন হার প্রভৃতির পরিমাপ দেখান সংখ্যাতাত্ত্বিকের কাজ। আবার জন্মহার, মৃত্যুহার প্রকৃত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সেকথা জীববিদ্যা বিশারদ ও চিকিৎসকরা বলবেন। প্রকৃত জনসংখ্যা তত্ত্ববিদ এদের সকলের মতামতকে ও কার্যপ্রণালীকে একত্রিত করে জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করবেন আশা করা যায়।

6.4 জনজীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধন নীতি

জনসংখ্যা নীতির ধারণা করতে গেলে আমরা সব সময়েই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে চলে আসি। কিন্তু জনসংখ্যা নীতি আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। জনতা সরকারের সময় প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই 'পরিবার পরিকল্পনা নীতির পরিবর্তে 'পরিবার কল্যাণ নীতি' প্রবর্তনের কথা বলা হয়। পরবর্তী সরকার নামটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। কিন্তু শুধু নাম পরিবর্তনে নীতি পরিবর্তন হয় না। প্রকৃত বিচারে জনসংখ্যার গুণগত উৎকর্ষ সাধন কিন্তু সবচেয়ে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। মানুষের জন্ম অনেকটাই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশে অনগ্রসর জনগণের মধ্যে জোর করে নিয়ন্ত্রণ নীতি চাপিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এদিকে পরিচালিত করা নৈতিক এমনকি রাজনৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য তা কিনা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অস্ত্রোপচারকে আকর্ষণীয় করার জন্য যে পরিমাণ ব্যয় করা হয় তার কিছু অংশও যদি বাসস্থান ও বিনোদনের উপকরণ যোগানোর জন্য ব্যবহার করা যেত তার ফলাফল কি হতে পারত একথা তেমন চিন্তা করে দেখা হয় না।

জনসংখ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রথমেই অবশ্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা গর্ভিনী মা ও সদ্যজাত শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা। শুধু তাই নয় শিশু মৃত্যুহার রোধ করার জন্য প্রসবকালেই উপযুক্ত শিক্ষিত ধাত্রীর সাহায্যের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রসূতিকে পৃথক রাখার বহু পুরাতন প্রথা এদেশে প্রচলিত। এটি একটি অতি সুপ্রথা। প্রসূতি এতে উপযুক্ত বিশ্রাম পায় ও সদ্যোজাত শিশু বাইরের সংক্রামণ রোগ থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এই প্রথা এখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ প্রসব কার্য অমলিন জ্ঞানে প্রসূতি ও শিশুকে অপরিষ্কার অবস্থায় রাখা হয়ে থাকে। পরিবার কল্যাণের প্রথম কথাই বোধ হয় প্রাক্ প্রসব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর অবস্থার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া।

এর পরেই আসছে পুষ্টি বিধান। দেশের জলবায়ু অনুসারে খাদ্যাভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। অনুন্নত দেশে অনেক সময় উন্নত দেশের অনুকরণ খাদ্য তালিকার পরিবর্তন

সাধন করতে গিয়ে হয়ত সঠিক পথে চলে না। যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জান্তব প্রোটিন শীতপ্রধান দেশের সমান পরিমাণে গ্রহণযোগ্য কিনা এটা আমাদের মতন দেশে ভেবে দেখার একান্ত প্রয়োজন আছে। সুলভে আঞ্চলিক খাদ্য যা পাওয়া যাবে তারই সুষম ব্যবহার করলেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। পুষ্টির জন্য দরকার শরীরের গঠন ও কায়িক শ্রম অনুসারে রুচিপূর্ণ উপযুক্ত আহার্যের ব্যবস্থা। অনুন্নত দেশে অনেকসময় মানুষ অর্ধাহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই অর্ধাহার থেকে আসে স্বাস্থ্যহানি ও শ্রমবিমুখতা। আবার আয় বৃদ্ধি ঘটলে যে সবসময় খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয় তা নাও হতে পারে। উন্নত দেশের সংস্পর্শে এসে অনুন্নত দেশের মানুষও এখন নতুন নতুন ভোগ্যদ্রব্যের সন্ধান পেয়েছে। ধনিক শ্রেণীর মধ্যে এদের বহুল প্রচার রয়েছে। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এদের অনুকরণে নানা ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে জীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের প্রথম ধাপ পুষ্টিসাধন এই লক্ষ্য থেকে মানুষ সরে যাচ্ছে। অনুকরণ পুষ্টির ক্ষেত্রে যে কত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মাতৃদুগ্ধ শিশুর একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য। আবার শিশু মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভরশীল হলে মাতার পরবর্তী গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পায়। শিশুকে কৃত্রিম শিশু খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টায় এখন অনেক অনুন্নত দেশের মায়েরা অগ্রণী। ফলে শিশুর ভরণপোষণে ব্যয় বাড়ছে, কিন্তু উপযুক্ত পুষ্টিসাধন হচ্ছে না। এই ব্যয় মায়ের পুষ্টিসাধনের জন্যই হওয়া দরকার ছিল। শিশু সাথে সাথে উপকৃত হত।

পুষ্টিসাধনের সাথেই আসে চিকিৎসা ও শিক্ষার কথা। ভারতে নানা শ্লোগানের মতন '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' এটিও খুব জনপ্রিয়। কিন্তু 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' মানে কি শুধু চিকিৎসক ঔষধ বর্জিত কতকগুলি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে 'মাথাপিছু চিকিৎসা কেন্দ্রের' লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছান? সুপুষ্টির সঙ্গে কতকগুলি স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারলে এমনি মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন কমে যায়। এর মধ্যে একটি হল পানীয় জলের সুব্যবস্থা ও অপরটি উপযুক্ত ভাবে ময়লা নিষ্কাশন। এই দুটির অভাবে অনেকসময় নানা সংক্রামক ব্যাধি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন দামী ওষুধ প্রয়োগ করে রোগ নিবারণ কি জনস্বাস্থ্য উন্নতির সঠিক পথ? গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা ও নগরাঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় ময়লা নিষ্কাশন বা ময়লার পূর্ণ ব্যবহারের কার্যপ্রণালী গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে স্বল্প ব্যয়ে ও প্রয়াসে অনেক সুফল পাওয়া যাবে। 'স্বাস্থ্যের যত্ন নাও' এই ধরনের কার্যপ্রণালী গ্রহণ

ক'রে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উন্নতিবিধান ও সেই সাথে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ, কম সন্তানের জন্মদানের গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা যেতে পারে।

এগুলি জনশিক্ষা কার্যসূচীর অন্তর্গত। সবদেশেই উচ্চশিক্ষা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর শিক্ষা বলতে শুধু ভাষাজ্ঞান বা গাণিতিক জ্ঞান বোঝায় না। শিক্ষার অর্থ মানুষকে উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে পরিচয় করান। যেহেতু বই-পত্রে এই সব ধারণা পাওয়া যায় তাই সাক্ষর মানুষ নিজের চেষ্টায় এই জ্ঞানার্জন করতে পারবে বলেই সাক্ষরতার দিকে জোর দেওয়া হয়। আবার জীবনযাত্রার জন্য অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে হবে। এর প্রথম ধাপই হ'ল হিসাব—কি কাজ বা কোন জিনিষের জন্য কত পেলাম ও কত দিলাম। সাধারণ গাণিতিক বিদ্যার প্রয়োজন এখানেই। এছাড়া পরিবেশ ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা উচিত। যে যে পেশায় লিপ্ত তার পেশাগত জ্ঞান কিছুটা থাকা দরকার। অবশ্য কাজের অভিজ্ঞতা এই ধরনের শিক্ষা দেয়। তবে পুঁথিগত শিক্ষারও কিছু মূল্য আছে। শিক্ষা মানুষকে উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে পরিচয় করায়। বিভিন্ন বিষয় মানুষের সঠিক ধারণা দেয়। জনজীবনের উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। শিক্ষা জনসংখ্যার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

6.5 আয়ুষ্কাল ও জনসংখ্যা নীতি—

একাধারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনজীবনের উৎকর্ষ সাধন নীতি গ্রহণ করলে দেশে একটি নতুন সমস্যার সূচনা হয়। উন্নত দেশগুলি এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের সেই অভিজ্ঞতার থেকে পূর্বভাবনা করা উচিত। আমরা আগেই দেখেছি যে জনসংখ্যা নীতির দুটি আবশ্যকীয় কার্যক্রম জন্মহার হ্রাস ও মৃত্যুহার হ্রাস। জন্মহার যদি বৎসরের পর বৎসর হ্রাস পেতে থাকে ক্রমশ ভবিষ্যতে অল্প বয়সে অর্থাৎ ধরা যাক 14 বছর পর্যন্ত বালক বালিকার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে আসবে। মধ্য বয়সে লোকসংখ্যা বাড়বে। জীবনের গতিপথে মৃত্যুর প্রভাব বেশী বয়সে বেশী কার্যকরী। মৃত্যুহার হ্রাস পাবার অর্থ প্রতি গোষ্ঠীতে বয়ঃসীমায় আরও এগিয়ে যাওয়া। ফলে জীবনের গতিপথে বর্তমানের মধ্যবয়সী লোকেরা যখন ভবিষ্যতের বৃদ্ধত্বের স্তরে এসে পড়বেন তখন বর্তমানের বালক বালিকাদের যুবা বয়স। মধ্যকালেই মানুষ উপার্জন ক'রে ও পরিবারের ভরণ-পোষণ করে থাকে। নিজেরা যে সন্তান সৃষ্টি করবে তাদের দায়িত্ব নিজেদের উপর থাকবে এটি সহজ কথা। কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যারা বর্তমান মধ্যবয়স্কদের সৃষ্টি করেছে তাদের দায় নিতে এরা কতটা ইচ্ছুক হবে তা সমস্যার বিষয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অর্থ পরিবার সীমিতকরণ। পরিবারে লোকসংখ্যা কম থাকলে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাড়ে ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। শিশু পালনে একটা আনন্দ আছে। কিন্তু বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পায়, নৈরাশ্যের ভাব বেশী থাকে গতিশীল সমাজে তাই তারা সহজে অপাঙক্তেয়। এদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিতে স্বাভাবিকভাবে মধ্য বা যুবা-বয়সীরা পছন্দ করবে না। বড় পরিবারে শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্ক, যুবক সকলেরই সংখ্যা বেশী। প্রত্যেক বয়স শ্রেণী নিজেদের একটা গোষ্ঠী বা সঙ্গী পায়। কিন্তু ছোট পরিবারে মোটামুটি সকলেই কিছুটা সঙ্গীহীন। অল্প বয়সে গতিশীলতা থাকে, পরিবারের বাইরেও সঙ্গী নির্বাচন করা যায়, নানা কাজকর্মে লিপ্ত থাকা যায় যা বেশী বয়সে সম্ভব নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়েছে। কিন্তু অবাঞ্ছিত নিঃসঙ্গ জীবন কি জীবনের গুণগত উৎকর্ষ সাধন করতে পারে ?

অবশ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে মানুষ বেশী বয়সেও নীরোগ, কর্মক্ষম থাকতে পারে। তাই বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কর্মে অবসর নেবার বয়স বৃদ্ধি করা উচিত। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেও যাতে কম শ্রমের প্রয়োজন হয় এমন কাজে বয়স্করা অন্তত আংশিকভাবে লিপ্ত থাকে তার জন্যও সচেষ্ট হওয়া দরকার। আধুনিক ছোট পরিবারে পরিবারের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। তাই কর্মক্ষম নয় এমন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের এসব পরিবারে ঠাঁই পাওয়া মুস্কিল। বর্তমানে পরিবারের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র এদের বসবাস, ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা আংশিক বা সামগ্রিক ব্যয়ভার গ্রহণের দায়িত্বও নেন।

ভারতে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বহুকাল ধরে সম্মানের আসনে রয়েছেন। কায়িক শ্রম বা অর্থ উপার্জন সম্ভব না হ'লেও তাঁরাই পরিবারের মুখ্য স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁদের পরামর্শ ও পরিচালনায় পরিবারের সকল কাজ হয়ে থাকে। অতীতের একান্নবর্তী পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্থান অনেক উঁচুতে ছিল। তাঁদের মতামত অগ্রাহ্য করা পরিবারের কারুর পক্ষেই সাধারণত সম্ভব হত না। অবশ্য এই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আধুনিক যুগের পরিবার-ভুক্তদের তুলনায় হয়ত কম বয়সী ছিলেন। আবার শুধু পরিবারে নয় গ্রামেও বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোকেদের পরামর্শ সকলে শুনে চলতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁরা মাতব্বর স্থানীয় হতেন।

বর্তমানে সর্বত্রই তরুণরা স্বনির্ভরশীল, স্বাধীন জীবনে আগ্রহী। পাশ্চাত্য দেশে তরুণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধদের একসাথে বসবাস রীতি বেশ কমে আসছে। এদের মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সমাজে পৃথক গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে। জনসংখ্যার গঠনও এমন দাঁড়িয়েছে যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সংখ্যায় নেহাত কম নন। তাই 'বুড়িয়ে যাওয়ার' সমস্যা ওদেশে প্রকট। এবং বার্ধক্যকে মেনে নিতে মানুষ ভীত। মা, বাবা ও অবিবাহিতা সন্তান নিয়ে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র পরিবারের

রীতি আমাদের দেশেও চলে আসছে। অবশ্য পরিবার সীমিত হ'লেও এদেশে পরিবার বন্ধনের মর্যাদা এখনও অনেকটাই রয়েছে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা তাদের সন্তানদের সঙ্গেই জীবন কাটান। গ্রামাঞ্চলে এ প্রথা যথেষ্ট বর্তমান। তবুও বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা নিয়ে এখানে কিছু কিছু ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষের সংমিশ্রন ও একত্রে থাকার একটা সুস্থ দিক রয়েছে। যুবা বয়সের উদ্দামতা একত্র সংযত হয় আবার বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতা দূর হয়। মধ্য বয়সের মানুষ যখন জীবন সংগ্রামের গভীরে ব্যস্ত জীবনযাপন করছে তখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সঙ্গদান করলে পরিবার ও সমাজ উভয়েই লাভবান হয়। তাই পাশ্চাত্য অনুকরণে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পৃথক আবাসস্থল তৈরী ক'রে ভরণপোষণের ভার নেওয়াই বার্ধক্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় মনে ক'রা যায় না। দেশ, কাল, চিরাচরিত প্রথা ভেদে এদেশে অন্য পথে চিন্তা করা উচিত। কারও কারও মনে বার্ধক্যে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করলে এদেশের মানুষ যৌবনে পরিবার বৃদ্ধি থেকে বিরত হবে। কারণ সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান সাধারণ মানুষ বার্ধক্যের অবলম্বন বলে মনে ক'রে। এই মত কতটা যুক্তিসঙ্গত তা অবশ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়নি। এই মনোভাব নিয়ে সন্তান সৃষ্টির প্রবণতা পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা তাও জানা সম্ভব নয়।

6.6 ভারতের জনসংখ্যা নীতি ও তার মূল্যায়ন—

বর্তমান ভারতে জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ। তাই পরিবার সীমিত করতে লোককে অনুপ্রাণিত করাই এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতই বোধহয় প্রথম দেশ যেখানে সরকারীভাবে পরিবার নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। 1951 সনে প্রথম এই নীতি চালু করা হয়। তার আগে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কিছু কিছু নজির আছে। যেমন অধ্যাপক রঘুনাথ দোন্ড কার্ভে 1925 সনে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক স্থাপন করেন। 1949 সনে শ্রীমতি ধনবতী রাওএর নেতৃত্বে বোম্বাইতে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হয়। এ বিষয়ে 1951 সন থেকে সরকারী উদ্যোগের মূল লক্ষ্য জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করা এবং সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি যাতে সকলের কাছে সহজলভ্য হয় তার ব্যবস্থা করা।

জনসংখ্যার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কের কথা সরকার প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা প্রক্ষেপ ক'রে নির্দিষ্ট সময় পরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবে বলা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন পূর্ব দশকের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি

ক'রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1951-61-র দশকে শতকরা 1.25 ভাগ হবে ধরে নেন। কিন্তু 1961 সনের আদমসুমারী অনুসারে দেখা যায় যে ওই সময়ে জনসংখ্যা শতকরা 2.2 হারে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দুই দশকে পরিবার পরিকল্পনার উপর যতই জোর দেওয়া হোক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত ছিল। প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যার চেয়ে কমই থেকে গেছে।

অবশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের উপরেই শুধুমাত্র জনসংখ্যা নির্ভরশীল নয়। মৃত্যুহার, পরিযান জনসংখ্যাকে যথেষ্ট প্রভাবিত ক'রে। মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। নিকটবর্তী বাংলাদেশ, সিংহল থেকে জনসমাগমও ভারতের কোন কোন রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। এই বিশাল দেশে যেখানে বিবাহ প্রায় সার্বজনীন ও গড়পড়তা বিবাহের বয়স খুব বেশী নয় সেখানে দ্রুত জন্মহার হ্রাস সহজ কথা নয়।

ভারত সরকার পরিবার পরিকল্পনার 'ক্যাফেটেরিয়া' নীতির প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ প্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণের সবরকম ব্যবস্থা জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া হবে। ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে লোকে এগুলি ব্যবহার করবে। প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য উন্নত দেশের পরিবার পরিকল্পনার ধারণা ভারতের নীতিবিদদের বিশেষ প্রভাবিত করে। ভারতের পরিবার পরিকল্পনা নীতি সব সময়ই বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সুবিধা সর্বসাধারণ্যে পৌছে দেবার জন্য ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

1966 সনে স্বাস্থ্য-দপ্তরের অধীনে একটি পূর্ণাবয়ব পরিবার পরিকল্পনা প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। জনসংখ্যা নীতি, পরিকল্পনার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য, এ ব্যাপারে গবেষণা প্রভৃতি সকল বিষয় এই প্রশাসনের অধীন। পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের সভাপতিত্বে একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সুষ্ঠুনীতি নির্ধারণ। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নানা আলোচনাচক্র ইত্যাদিও দেশে সংগঠন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী কেন্দ্রীয় মহলে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ সারা দেশের লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে স্থির হয়। কোন রীতির উপর কিরকম গুরুত্ব কখন দিতে হবে তাও কেন্দ্রীয় প্রশাসন স্থির করে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত ব্যয়ের শতকরা 96/97 ভাগ কেন্দ্রই দিয়ে থাকেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এ ব্যাপারে সরকারী দাক্ষিণ্যের কখনও অভাব ঘটে না। অর্থাভাবে কোনও কার্যসূচী গ্রহণ করা যায়নি একথা কখনও শোনা যায় না। কিন্তু কেন্দ্রীভূতভাবে এই কার্যসূচী পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

সেইজন্য রাজ্য স্তরে স্বাস্থ্য-দপ্তরের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা ব্যুরো গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যগুলি আবার জেলা স্তরে জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার নিয়োগ ক'রে তার অধীনে একটি কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করেছে । জনসাধারণের মধ্যে কার্যসূচী রূপায়িত করবার জন্য নগরাঞ্চলে রয়েছে শহরে অবস্থিত পরিবার কল্যাণ ক্লিনিক ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক ও সাহায্যকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের কর্মচারীরাই জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছেন, তাদের পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী গ্রহণের গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন। বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা আগেই দেখেছি বন্ধ্যা বা নিবীর্জকরণ সবচেয়ে কার্যকরী উপায় কারণ তাতে প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে লোপ পায়। সুতরাং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এসম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়। দরিদ্র জনসাধারণকে উৎসাহিত করার জন্য সামান্য আর্থিক অনুদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী রূপায়িত করার জন্য সরকার কিন্তু কখনই বাধ্যতামূলক কার্যসূচী গ্রহণ করেননি। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, আর্থিক অনুদান দিয়ে এই কার্যসূচী রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'জরুরী অবস্থার' সময় কোনও কোনও রাজ্যে এই কার্যসূচীর উপর কিছু বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশব্যাপী বিরোধী প্রচার সুরু হয়ে যায়। পরবর্তী জনতা সরকার জনসাধারণের অনুভূতির প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে 'পরিবার কল্যাণ কার্যসূচী' চালু করার কথা ঘোষণা করেন। কার্যত অবশ্য এই সময় 'কল্যাণ' বা 'নিয়ন্ত্রণ' কোনও কার্যসূচী সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইন্দিরা সরকার নীতির নাম পরিবর্তন করেননি এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রচারে আগ্রহী হননি। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেবেন তা পরিস্কার নয়।

সরকারী নীতির আভাষ আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে পেয়ে থাকি। একবিংশ শতাব্দীতে নতুন ভারত গঠনের সূচনা হচ্ছে এই শ্লোগান এখন খুব শোনা যাচ্ছে। 2000 সনে সকলে স্বাস্থ্যের সুবিধা পাবে। এটি স্বাস্থ্য দপ্তরের লক্ষ্য। এই দপ্তরের প্রতিবেদনেও দেখা যাচ্ছে 2000 সনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের সামনে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

1) নীট প্রজনন হারকে 1.67 থেকে 1.00 তে নামাতে হবে।
2) পরিবারের গড় আয়তন 4.2 জন থেকে কমিয়ে 2.5 জনে আনতে হবে।
3) জন্মহার হাজারে 33 জন থেকে 21 জনে নামাতে হবে।

4) তেমনি মৃত্যুহার হাজারে 14 থেকে 9 এ আনতে হবে।

5) শিশু মৃত্যুর হার হাজারে 60 করতে হবে এবং

6) প্রসূতি মৃত্যুর হার 5-8 থেকে 2 এর নীচে নামাতে হবে।

দেশের সর্বসাধারণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় আনতে হবে। এইভাবে চলতে পারলে এই প্রতিবেদনের মতে এই শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা 90 কোটিতে দাঁড়াবে।

লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসংখ্যার গতি নির্ধারণে বিভিন্ন দিকের প্রতি নজর দিয়েই এই লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত জনসংখ্যা নীতি ও তার রূপায়ণে আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাতে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে। ভারতে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও এ সম্পর্কিত আলাপ আলোচনায় আধুনিক শিক্ষিত সমাজ উদ্যোগী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যত নতুন নীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে সেগুলি এদেশে পরীক্ষা করতে এঁরা উৎসাহী। ফলে আধুনিক সবরকম পদ্ধতির সঙ্গে এদেশের পরিচয় ঘটেছে। বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করে বিদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করার দিকে দিল্লীর নীতি রচনাকারীরা উৎসাহী।

কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি রচনায় বা তার বাস্তব প্রয়োগে অর্থনৈতিক স্তর, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাস্থ্যের অবস্থা, ধর্মীয় ধারণা প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব বিষয়গুলি ভালভাবে অনুধাবন না ক'রে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার কোনও যুক্তি নেই। নীতি নির্ধারকরা মনে হয় এই পটভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয় এবং তাঁদের কার্যসূচী তারা পরপর সূত্রে আদেশ জারি ক'রেই রূপায়িত করতে চান। ফলে নীতি কার্যকরী করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পড়ে সর্বনিম্ন ইউনিটের স্বল্প আয়ের কর্মচারীর উপর। তারা সোজা উপায়ে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র জনসাধারণকে বন্ধ্যা বা নির্বীর্জকরণে উৎসাহিত ক'রে। প্রজনন ক্ষমতা বয়সের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকে নজর দিতে গিয়ে এই স্বল্প আয়ের কর্মচারীরা বয়স নির্বিশেষে নির্বীর্জকরণ বা বন্ধ্যাকরণ ঘটিয়ে থাকেন। ফলে যে পরিমাণ ব্যয় হয় সে পরিমাণ ফললাভ হয় না।

আপাতদৃষ্টিতে এদেশের পরিবার পরিকল্পনা নীতিতে কোনও বাধ্যতামূলক কার্যসূচী নেওয়া হবে না একথাই স্থির। স্বভাবতই গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি মেনে নিলে পরিবারের আয়তন ব্যক্তিবিশেষের বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির সম্পর্কে লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় স্তরে নির্ধারিত

ক'রে স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের মধ্যে সেই লক্ষ্যকে কাজে রূপায়িত করার আদেশ দেওয়া কি বাধ্যতামূলক নয়? যে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আজ আমাদের নীতি নির্ধারকরা পরিবার নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী যেসব দেশে কখনই লক্ষ্যমাত্রা স্থির ক'রে পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়নি। আবার পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনের কর্মসূচীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির জন্য চীনের আরও কিছু কর্মসূচী আছে। বিশেষ চীনের সমাজ ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক কর্মসূচীর সাধারণভাবে আমরা সমালোচনা ক'রে থাকি। সুতরাং এই বিশেষ ক্ষেত্রে চীনের সাফল্যকে এত গুরুত্ব দেবার কারণ কি?

পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত বিশেষ ক'রে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যপুষ্ট হয়ে আজ আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী গ্রহণ ক'রে তা কতটা সার্থক হ'ল সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার দিকে খুব নজর দেওয়া হচ্ছে। বিদেশী সংস্থার সহায়তায় ভারতের 13টি রাজ্যের 66টি জেলায় 'আঞ্চলিক প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের পরীক্ষাগার? উন্নত দেশের অনুকরণে গর্ভমোচন আইনসিদ্ধ হয়েছে। 1972এর 1লা এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকরী। অবশ্য বলা হয়েছে যে গর্ভিনীর সম্মতি নিয়ে স্বাস্থ্যের অজুহাতেই গর্ভনাশ করা যাবে। এই জাতীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদির উপরই অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না ক'রে সত্যিকারের সমস্যা অনুধাবন ক'রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী করার প্রয়োজন। লুপের পরিবর্তে ল্যাপ্রোস্কপি কতদূর কার্যকরী এ চিন্তাই আজকের ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবার পরিকল্পনা নীতি ব'লে মেনে নেওয়া যায় না।

জনসংখ্যা প্রক্ষেপের গাণিতিক নীতি প্রয়োগ ক'রে আধুনিক তাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জনসমষ্টি সম্পর্কে নানা মতামত প্রকাশ ক'রে চলেছেন। সব ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা সাধারণভাবে নৈরাশ্যবাদী। ভারতের মতন বিপুল জনসমষ্টির দেশ সম্পর্কে তাঁরা স্বভাবতই ভবিষ্যতের কোন আশার বাণী শোনাতে পারেন না। তাঁদের একমাত্র সুপারিশ কঠোর হস্তে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এই আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যসূচীকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রূপায়িত করার জন্য এক বিরাট কর্মীগোষ্ঠীকে সরকার কাজে লাগিয়েছেন। আর্থিক পুরস্কার প্রদানের ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে। স্ত্রী, পুরুষ যাঁরা এই কর্মসূচীর আওতায় আসছেন এবং যাঁরা তাঁদের নির্বীজকরণ বা বন্ধ্যাকরণে উৎসাহিত করছেন উভয় গোষ্ঠীই সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পাচ্ছেন। দেশে কি ধরনের কার্যসূচী নেওয়া হবে এবং বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কি কি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হবে তা সরকারী ব্যবস্থাপনার

একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্নগোষ্ঠী কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ করছেন। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে রাজ্য পর্যায় এই সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে রূপায়িত করার ব্যবস্থা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য রাজ্যস্তরে পুরস্কার প্রদানও করা হয়ে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে খবরাখবর প্রদানও পরিবার সীমিত করার উপকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার দায়িত্ব একান্ত নিম্নস্তরের কর্মীদের উপর রয়েছে। প্রকৃত জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী থেকে উপরওয়ালাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকেই এঁদের ঝোঁক বেশী।

সংখ্যার দিক থেকে বিচার করতে গেলে 80র দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কিত যে সব লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল তা অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে। 1980-81 থেকে 1984-85 সনের মধ্যে বন্ধ্যাকরণ ও নিবীর্জকরণের ক্ষেত্রে শতকরা 70 থেকে 96 ভাগ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। লুপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও ওই সময়ের মধ্যে অনুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছে।[5] প্রশ্ন উঠে এই ধরনের সাফল্যেই কি জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সার্থকতার মাপকাঠি ?

শিশুর জন্মদান অসংখ্য দম্পতির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এই সিদ্ধান্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা অনেক সময় অধিক সন্তান সৃষ্টির কারণ হয়। বিশ্বযুদ্ধের মহামারীর মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে তুলনামূলকভাবে জন্মহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদের দেশে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় নিম্নবিত্ত পরিবারে তুলনামূলকভাবে বেশী শিশু জন্মাচ্ছে। এখানে বিবাহের বয়ঃসীমা বেশ নীচে। কারণ গৃহকর্ম ছাড়া মেয়েদের নিযুক্তির অন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। পারিবারিক জীবনে বিবাহই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পুত্র সন্তান ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ধারক, বৃদ্ধ বয়সে সেই মা-বাবার ভরণপোষণ করবে। অতএব অন্তত দুটি পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা খুবই প্রবল। সেজন্য বাড়তি কয়েকটি অনাদৃতা কন্যা সন্তানের জন্মও মেনে নিতে হচ্ছে। এ ধরনের মনোভাব যেখানে অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল সেখানে একটি মা দুটি শিশুর মাপকাঠি কার্য করা সহজসাধ্য নয়। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবার সীমিত করার প্রবনতা যেভাবে কার্যকরী নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে তা নয়। এদিক থেকে বিচার করলে জনসংখ্যার মধ্যে একটি ভারসাম্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। নীতিবিদরা এ ব্যাপারে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয় না।

পরিবার সীমিত করার নীতিকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করতে হ'লে একটি সার্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রয়োজন। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। শিশুমৃত্যু

হ্রাস পেলে অধিক সন্তান জন্ম দেবার প্রবণতা কমে যায়। অন্তত কয়েকটি সন্তানও যাতে জীবিত থাকে সেজন্য নিম্নবিত্ত মা, বাবা একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে চায়। সবকটি সন্তানই জীবিত থাকবে এই আশ্বাস পেলে তারা অপেক্ষাকৃত কম সন্তানের জন্ম দেবে।

1974 এর বুখারেষ্টএর আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলনে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং বলেছিলেন 'উন্নয়ন সর্বাপেক্ষা কার্যকরী জন্ম নিরোধক'। এই শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়। 1984র মেক্সিকোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের আয়োজিত অনুরূপ দ্বিতীয় সম্মেলনে ভারত তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভারত কি এখনও করণ সিংএর শ্লোগানের গুরুত্ব সঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। আমরা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বহু সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করি। কিন্তু সমাজে শিক্ষা ও আয় অনুসারে স্তর বিভাগ ক'রে বিভিন্ন স্তরে জন্মহার কিভাবে হ্রাস পেয়েছে এ ধরনের আঞ্চলিক সমীক্ষাও বড় একটা দেখি না। অথচ এর মধ্যেই বোধ হয় প্রকৃত সত্য লুকিয়ে রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে সেগুলি কতদূর প্রবর্তন করা যায় সেই চেষ্টা করা এমন কথা মনে করলে কখনই উপযুক্ত ফললাভ হবে না। সমাজের নিম্নস্তরে আয় বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা এগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। বিশেষ ক'রে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অর্থকরী কাজকর্মে নারীদের অধিকতর অংশ-গ্রহণ পরিবার সীমিত করার অন্যতম উপায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলিকে জনপ্রিয় করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার কিছু অংশও যদি জনসংখ্যার সমস্যা ও বর্তমান যুগে বৃহৎ পরিবার সৃষ্টির অসুবিধার কথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যয় করা যেত তবে জন্মহার হ্রাস করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত। মোট কথা 'পরিবারের আয়তন' ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটালে মানুষ নিজেই অনেকাংশে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

টীকা

1. দ্রষ্টব্য Kenneth E. Boulding—Population, the first essay.
2. দ্রষ্টব্য Paul Ehrlich—The Population Bomb.

3. দ্রষ্টব্য Prof. Asish Bose – Presidential address, 10th Annual Conference I A S P May 20, 1985.

4. দ্রষ্টব্য Government of India, Ministry of Health and Family Welfare—Report of the Working Group on Health for All by 2000 A. D., New Delhi 1981.

5. দ্রষ্টব্য Ministry of Health and Family Welfare. Family Welfare Year Books 1980-81—1984-85.
